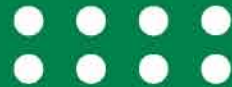


সামাজিক বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ
থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সামাজিক বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণী

রচনায়

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী

মুহম্মদ আনসার আলী

লুৎফর রহমান

নাজনীন বেগম

সম্পাদনায়

মোঃ শামসুল হক

ড. সিরাজুল ইসলাম

মোহাম্মদ জুনাইদ

ড. এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৬

সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০

সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮

সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ

ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ

সেলিম আহমেদ

চিত্রাঙ্কন

বিপ্লব সরকার

মানচিত্রাঙ্কন

দি ম্যাপ্পা

গ্রাফোসম্যান

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সমন্বয়যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি ও জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়বস্তু সমন্বয়ে এবং নতুন নামকরণ ও আঙ্গিকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিখনফলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয়বস্তু চয়ন করা হয়েছে। বিষয়টির পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তন ও অগ্রগতির ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। আশা করা যায়, এটি পাঠে তরুণ শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবে, সুনামের গুণাবলি অর্জন করবে এবং তাদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে। তদুপরি পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু অধ্যয়নের মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের উচ্চতর জ্ঞানলাভের ভিত্তিও রচিত হবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিদ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	সামাজিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা	১
দ্বিতীয়	ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন	১৫
তৃতীয়	ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা	১৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	সিরাজ-উদ-দৌলা ও পলাশী যুদ্ধ	১৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	মীর কাসিম ও বকসারের যুদ্ধ	২১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	কোম্পানির দিওয়ানি লাভ ও দ্বৈতশাসন	২২
চতুর্থ	ইংরেজ শাসনের প্রভাব	২৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও এর প্রভাব	২৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব	২৬
পঞ্চম	বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন	৩০
প্রথম পরিচ্ছেদ	বাংলার জাগরণ	৩০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	বাংলায় সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার	৩৩
ষষ্ঠ	রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলন	৩৯
সপ্তম	বাংলাদেশের অভ্যুদয়	৪৬
অষ্টম	বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও ঘোষণাপত্র	৫২
নবম	ইউরোপ মহাদেশ	৫৬
দশম	উত্তর আমেরিকা মহাদেশ	৬৭
একাদশ	দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ	৭৬
দ্বাদশ	বাংলাদেশ-শিল্প ও বাণিজ্য	৮৫
ত্রয়োদশ		
প্রথম পরিচ্ছেদ	সংবিধান	৯৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	বাংলাদেশের সংবিধান-ক	১০১
	বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা-খ	১০৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	জাতিসংঘ	১০৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা	১১০
চতুর্দশ	অর্থনীতির চারটি মৌল বিষয়-ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও বাজার	১১৭
পঞ্চদশ	বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা	১২৩
ষোড়শ	যৌতুক প্রথা ও বাংলাদেশের নারী	১৩১

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা

সামাজিক পরিবর্তন

মানব সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজের এ পরিবর্তন আদি যুগ থেকেই চলে এসেছে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় এ পরিবর্তন আরও বেগবান হয়েছে। অজানাকে জানার জন্য, বাধাকে দূর করার জন্য, নতুনকে পাওয়ার জন্য মানুষ সदा ব্যাকুল। যার ফলে মানব সমাজে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সামাজিক আচরণবিধি, রীতিনীতি ও চিন্তাধারারও পরিবর্তন হয়েছে।

সাধারণভাবে সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনকে বোঝায়। গোটা সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন অথবা সমাজ কাঠামোর বিশেষ বিশেষ উপাদানের পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমরা সমাজ কাঠামোর পুনর্গঠন বা রূপান্তর বুঝি। অর্থাৎ একটি বিশেষ সামাজিক রূপ থেকে অন্য রূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে। এটি একটি অনবরত চলমান গতিধারা। সামাজিক পরিবর্তন কখনও ক্ষণস্থায়ী আবার কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয়। নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে সমাজের পরিবর্তন ক্রমাগত ঘটে চলেছে। পরিবর্তন কখনও দ্রুতগতিতে, কখনও মন্থগতিতে সম্পন্ন হয়। কখনও বিশেষ একটি কারণে আবার কখনও একাধিক কারণে এ পরিবর্তন ঘটতে পারে। সমাজ পরিবর্তন বলতে মূলত মানুষের জীবনযাত্রারই পরিবর্তন বোঝায়। বর্তমানকালে পরিবর্তনের এ ধারা অতীতের তুলনায় অনেক দ্রুত।

সামাজিক পরিবর্তন কতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এগুলো সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হল—

- ১। সামাজিক পরিবর্তন বৈচিত্র্যময়। সামাজিক পরিবর্তন কখনও পরিকল্পিত ও একমুখী, আবার কখনও অপরিকল্পিত ও বহুমুখী। এ পরিবর্তন কখনও দীর্ঘস্থায়ী, কখনও ক্ষণস্থায়ী, কখনও মানবকল্যাণমূলক আবার কখনও ক্ষতিকর।
- ২। সামাজিক পরিবর্তনের পেছনে বিচিত্র কারণ কাজ করে ফলে সামাজিক পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আগে ভাগে সঠিক কিছু অনুমান করা যায় না।
- ৩। প্রত্যেক সমাজের পরিবর্তনের একটা নিজস্ব ধারা থাকে। তাই সামাজিক পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রতিটি সমাজের স্বাভাবিকতা ও স্বকীয়তা বজায় থাকে।
- ৪। সকল সমাজেই সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তবে সমাজভেদে পরিবর্তনের গতি ও মাত্রার তারতম্য ঘটে। পরিবর্তনের ধারণাকে তিনটি কালে ভাগ করা যায়। যেমন, প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক।

প্রাচীনকালের ধারণা : প্রাচীনকালে মানুষ একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় সুখী জীবনযাপন করত। স্থিতিশীল সে সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর বা পরিবর্তনকে তারা অবস্থার অবনতি ঘটেছে বলে মনে করত। তাদের এ ধারণার পেছনে রয়েছে অলৌকিক বিশ্বাস ও পরকালের অস্তিত্ব। আবার কেউ কেউ মনে করেন প্রাচীন স্তরে সমাজে দ্বন্দ্বভাব বিরাজমান ছিল। সমাজে টিকে থাকার জন্য মানুষ সর্বদা কলহে লিপ্ত থাকত। কিন্তু কালক্রমে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে একটি শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হল।

মধ্যযুগীয় ধারণা : মধ্যযুগে সমাজের পরিবর্তন বলতে বুঝা যেত পরকালের জন্য প্রস্তুতি। তারা ধারণা করত বিধাতা বিশ্বকে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করেছেন। যখন তাঁর এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে তখন এ বিশ্বের পরিবর্তন হয়ে অনন্তে মিলিয়ে যাবে। তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রকৃতিতে যে ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটত তা থেকে এ ধারণা জন্মেছে। মধ্যযুগ হচ্ছে দার্শনিক যুগ।

আধুনিক যুগের ধারণা : আধুনিক যুগে সবাই মনে করে যে সামাজিক জীবনে চলমান অগ্রগতির অর্থই হচ্ছে পরিবর্তন। এক্ষেত্রে মানুষ নিজের মাঝে একটি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। মানুষ নিজেই তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রা।

এ ধারণার দ্বারা মানুষ সমাজের তথা নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে চেয়েছে। এ যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করেছে এবং প্রকৃতিকে বশ করে স্বীয় কল্যাণে নিয়োজিত করেছে।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন মানুষের কাম্য। কারণ মানুষের বৃদ্ধিমত্তা দিন দিন বাড়বে এবং এর সাথে সমাজের রূপান্তরও ঘটতে থাকবে। কার্ল মার্কস মানব সমাজের পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে দুইটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে (১) উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ও (২) শ্রেণী সম্পর্ক। তাঁর মতে, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে শ্রেণী সংঘাতের সৃষ্টি হয় ফলে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছে। তাঁর মতে, শ্রেণীহীন সমাজ হচ্ছে সমাজের পরিবর্তনের শেষ পর্যায়। এ পর্যায়ে এসে সমাজের মধ্যকার আপোসহীন দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ –

আদিম যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে সমাজ বিকাশ লাভ করেছে। সামাজিক পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা গেছে, একই সমাজে একই সময়ে বিভিন্ন বিষয় বা উপাদান পরিবর্তনের পিছনে কাজ করেছে। সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক পরিবর্তনের কতকগুলো বিশেষ কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা (১) ভৌগোলিক কারণ (২) জৈবিক কারণ (৩) জনসংখ্যা (৪) রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ (৫) অর্থনৈতিক কারণ (৬) শিক্ষা (৭) মহৎ ব্যক্তির ভূমিকা (৮) নতুন আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতির প্রভাব এবং (৯) পরিবহণ ও যোগাযোগ। নিচে কারণগুলো বর্ণনা করা হল :

(১) **ভৌগোলিক কারণ** : ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সমাজ জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভৌগোলিক পরিবেশের ব্যবধানে মানুষের জীবনযাত্রা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ভৌগোলিক পরিবর্তন সমাজে নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে। পরিবেশে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোনো স্থান থেকে কোনো সমাজকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। অথবা কোনো সমাজে হঠাৎ করে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

(২) **জৈবিক কারণ** : বর্ণ বা গোত্রগত উত্তরাধিকার বা বংশের প্রভাবকে সমাজ বিকাশের কারণ বলে মনে করা হয়। একটি বিশেষ গোত্র বা শ্রেণীর সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা অন্য সমাজের ওপর প্রভাব ফেলে।

(৩) **জনসংখ্যা** : জনসংখ্যার গড়ন ও এর ভেতরের পরিবর্তন সমাজ জীবনে পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। এ পরিবর্তন একাধারে পারিবারিক জীবন, দলীয় জীবন, সমাজ জীবন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে পরিবর্তন আনে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস একটি সমাজের পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

(৪) **রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ** : বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক ধ্যান ধারণা সমাজ বা দলীয় মনোভাবকে গতিশীল করে তোলে। এভাবে সমাজ কাঠামো বদলায়। এছাড়া রাজনৈতিক বিশেষ কোনো ঘটনা এবং সমাজ সংস্কার সমাজের পরিবর্তন ঘটায়।

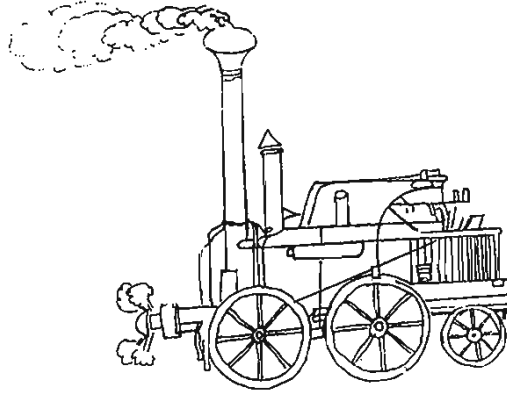
(৫) **অর্থনৈতিক কারণ** : অর্থনীতি হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এর ওপর নির্ভর করে সমাজে ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি গড়ে ওঠে। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা বিভিন্ন শ্রেণী, দল, প্রথা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি মানুষের পরস্পর সম্পর্কের মাঝে পরিবর্তন ঘটায়।

(৬) **শিক্ষা** : শিক্ষা মানুষের প্রকৃতি ও আচরণে পরিবর্তন আনে। শিক্ষা মানুষের মাঝে সুন্দর গুণগুলোকে ফুটিয়ে তোলে। আবার এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজকেও প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি শিক্ষা হচ্ছে সামাজিক শিক্ষাদানেরও একটি বিশেষ পদ্ধতি। একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই তার সামাজিক শিক্ষাদান শুরু হয়। এখানে শিশু ছাত্র আর সমাজ শিক্ষক। পরিবার, সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমেই এ শিক্ষাদান শুরু হয় ও চলতে থাকে। এ শিক্ষার পাশাপাশি স্কুল কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মানুষের মাঝে সামাজিক আদর্শ, ভাবধারা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় এবং কালক্রমে এগুলো স্থায়ী রূপ লাভ করে। শিক্ষার মাধ্যমে এক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইতিহাস ও সভ্যতা অন্য যুগে প্রবাহিত হচ্ছে। অতএব সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষা একটি মুখ্য কারণ। শিক্ষা মানুষের চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এতে ধ্যান ধারণার শ্রীবৃদ্ধি হয়। মানুষ অল্প কুসংস্কার ও যুক্তিহীন জীবনচরণ থেকে বিরত থাকে। শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে, মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। আধুনিককালে বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে জাপান জার্মানি যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ রাষ্ট্র ও সমাজ পরিবর্তনে বিপুল সফলতা লাভ করেছে। বাংলাদেশও শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও বাস্তবমুখী করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

(৭) মহৎ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির ভূমিকা : মহৎ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির ভূমিকা সমাজে পরিবর্তন নিয়ে আসে। যেমন— এক জন সংস্কারক তাঁর মহৎ চিন্তাধারা ও আদর্শ দ্বারা সমাজে প্রচলিত নানা রকম প্রথা প্রতিষ্ঠান ও আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। এদের সংস্কারের ফলে সমাজে কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর হয়।

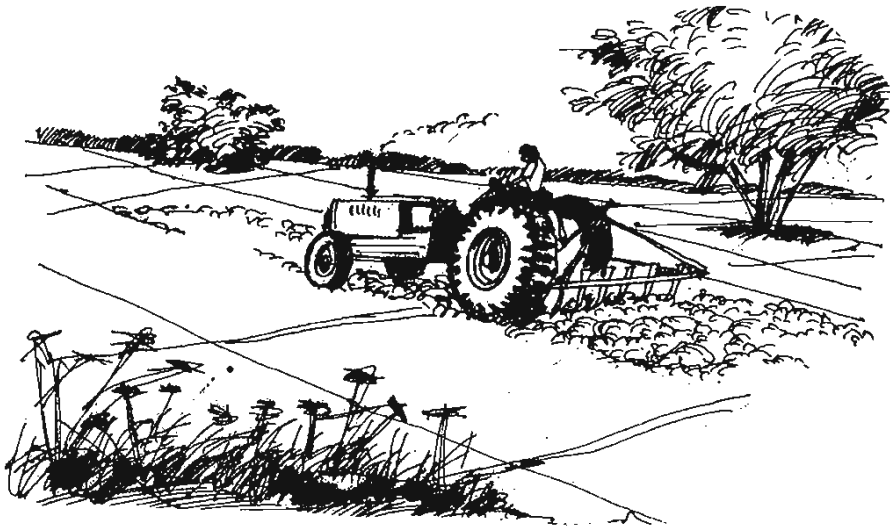
সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব এবং সমাজ সংস্কারকদের ভূমিকা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। একজন সুযোগ্য নেতা একটি জাতিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারেন। যেমন, জর্জ ওয়াশিংটন, কামাল পাশা, রাজা রামমোহন রায়, বেগম রোকেয়া, লেনিন, মহাত্মা গান্ধী, এ কে ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখের অবদান জাতির কাছে চিরস্মরণীয়।

(৮) নতুন আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতির প্রভাব : নতুন নতুন আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি সমাজ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং যন্ত্র সত্যতা শিল্পায়ন ও নগরায়ণের সূচনা করে। এসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের উৎকর্ষের সাথে সাথে শিল্প ব্যবস্থার ও শহরাঞ্চলের প্রসার ঘটে থাকে। ফলে সমাজে নানারকম পরিবর্তন আসে। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপের সমাজ কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। আর্করাইটের সূতাকাটার কল আবিষ্কার বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠায়, জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিন যাতায়াত ব্যবস্থায় ও শিল্পে অভাবনীয় পরিবর্তন আনে। আধুনিক সভ্যতার প্রসারে এসব যান্ত্রিক আবিষ্কারের ভূমিকা অনন্য।



চিত্র ১ : স্টিম ইঞ্জিন

ফ্যারাডের বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে যন্ত্র ব্যবহারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। কৃষিতে বিভিন্ন যন্ত্র যেমন— ট্রাক্টর ও সেচ পাম্প ব্যবহারের ফলে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

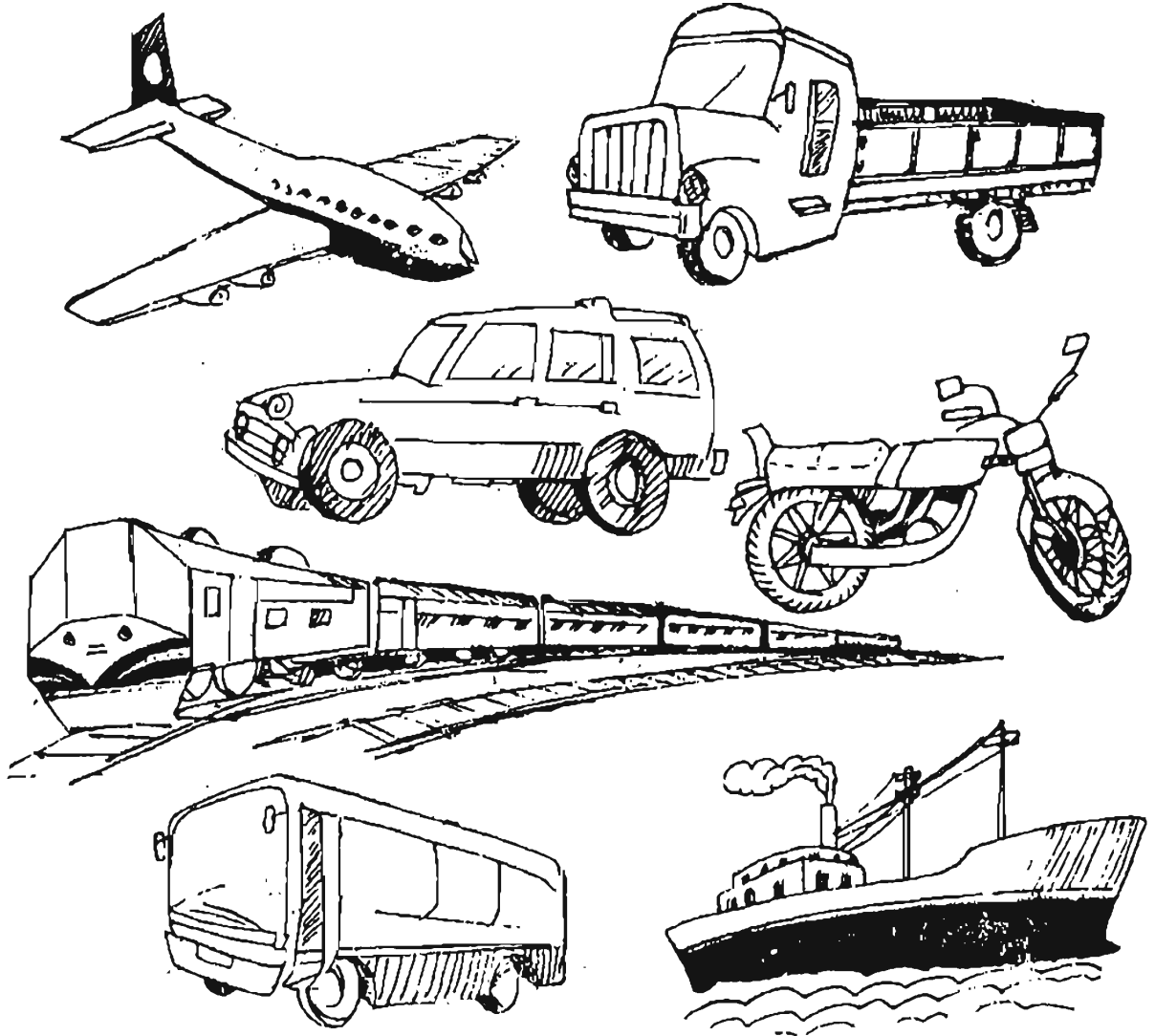


চিত্র ২ : ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ

নতুন আবিষ্কার ও বিভিন্নমুখী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাপক ও দ্রুতহারে হচ্ছে। মানুষের সামাজিক অভ্যাস ও আচার অনুষ্ঠান পরিবর্তিত হচ্ছে। শিল্পায়নের ফলে মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। গ্রামীণ জীবনধারাও তার ফলে বদলে যাচ্ছে। মানুষের জীবনের মান উন্নত হচ্ছে। জীবনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি ও গতি।

(৯) পরিবহণ ও যোগাযোগ : আদিমকালে মানুষ পায়ে হেঁটে চলাচল করত। কাঁধে পিঠে নিজেদের মালামাল বহন করত। কিন্তু এভাবে বেশি মালামাল বহন করা যেত না। তাছাড়া এ ব্যবস্থা ছিল খুবই কষ্টকর। মানুষ চলাচল ও মাল বহনে সহজ ও দ্রুততর কোনো পরিবহণের কথা ভাবতে থাকে। ভাবনার ফলে আবিষ্কার হয় চাকা। চাকার ওপর তৈরি গাড়ি পশুর সাহায্যে টেনে অথবা মানুষ নিজে ঠেলে অনেক বেশি মাল অল্প সময়ে বহন করতে সক্ষম হল। নিজেদের যাতায়াতের কাজেও এ গাড়ি ব্যবহার করতে থাকে।

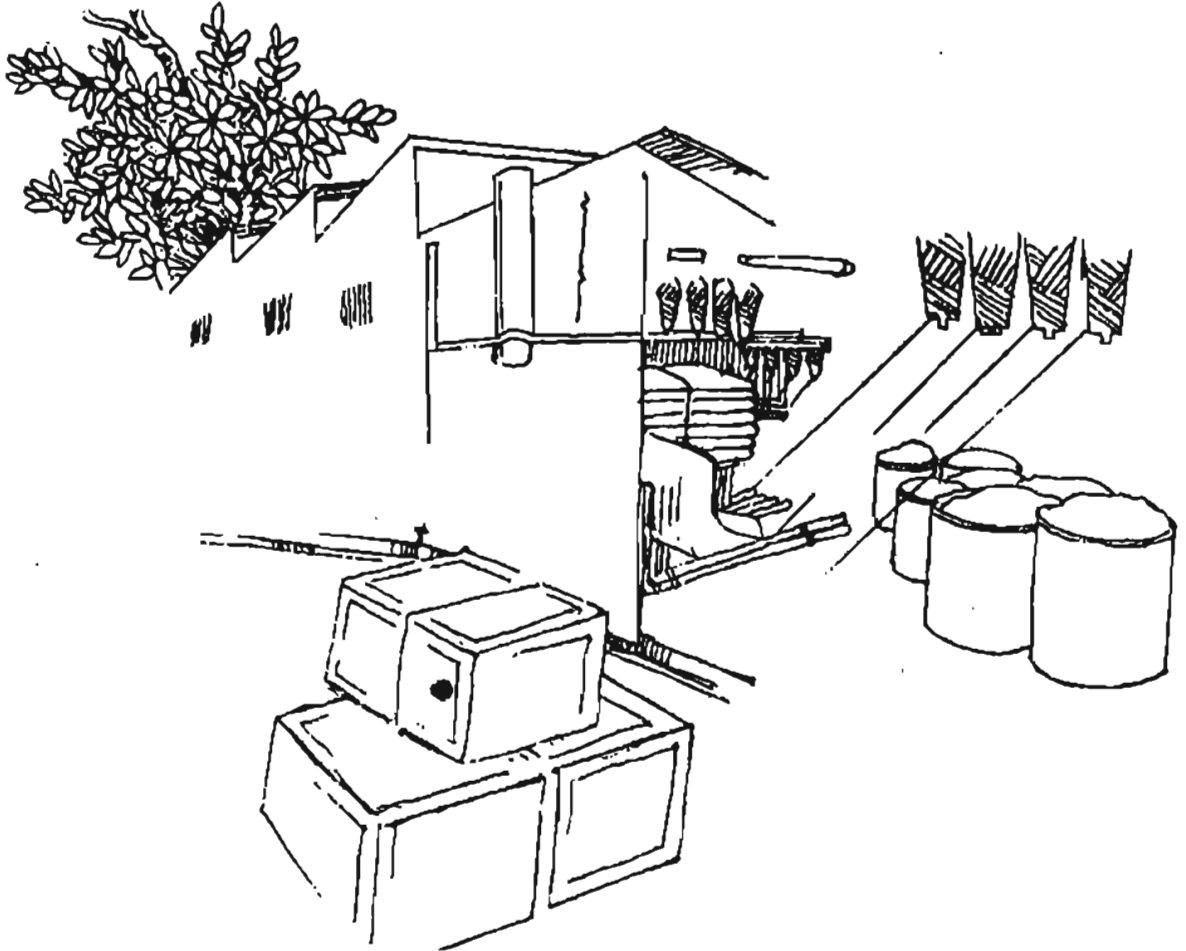
পানি পথে যোগাযোগ ও পরিবহণের জন্য আবিষ্কৃত হল নৌকা, ভেলা ইত্যাদি। কিন্তু এসব যানবাহনও ধীরগতিসম্পন্ন ছিল বলে সময়ের সমস্যা মানুষের রয়েছে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে এ সমস্যা অনেকখানি দূর হল।



চিত্র ৩ : কয়েকটি আধুনিক যানবাহনের নমুনা

জল ও স্থলপথে পরিবহণে এল পরিবর্তন। মোটরগাড়ি, জীপ, বাস, ট্রাক, ট্রাম, রেলগাড়ি এবং জাহাজ মালামাল ও যাত্রী পরিবহণে নিযুক্ত হল। তারপর আকাশপথে চলাচলের জন্য আবিষ্কৃত হল উড়োজাহাজ। আরও স্বল্প সময়ে যোগাযোগ ও পরিবহণ সম্ভব হল। এভাবে দ্রুত ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। সুদূর পল্লী গ্রামের কৃষিপণ্য শহরে আসে আবার কলকারখানায় উৎপাদিত পণ্য গ্রামে যায়, কিছু যায় জাহাজ ও বিমানযোগে দূর বিদেশে। দেশে দেশে আমদানি রপ্তানি শুরু হল। পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার ঘটায় উৎপাদন ও বণ্টন অধিকতর গতিশীল হয় এবং এ দুইয়ের মধ্যে সমতা হল। মানুষের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আসে।

কোনো বিশেষ এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত মানুষের সেবায় দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো সহজ হয়ে গেল। রোগে, দুর্ঘটনায় আর্ত মানুষকে শহরে বা হাসপাতালে প্রেরণ সহজ হল। ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ও নির্মাণ সামগ্রী যথাসময়ে পাঠানো সম্ভব হয়। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাফ, ই-মেইল ও ভূ-উপগ্রহ প্রভৃতির সাহায্যে আজকাল মুহূর্তের মাঝে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে খবরাখবর প্রেরণ ও গ্রহণ সম্ভব।



চিত্র ৪ : বস্ত্র তৈরির একটি আধুনিক কারখানা

সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমগুলো হল যোগাযোগের অন্যতম উপায়। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এসব মাধ্যম অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য ও ভাব বিনিময়ের সাথে সাথে জ্ঞান অর্জনের উৎস হিসেবে কাজ করে। আধুনিক ছাপাখানায় বই পুস্তক মুদ্রিত হয়ে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে বই পুস্তক, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসার ঘটে। যে কোনো দেশের জ্ঞান

বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ভাষা ও সাহিত্য এসবের মাধ্যমে অন্যদেশে বিস্তার লাভ করে। ফলে শিক্ষা সংস্কৃতির আন্তঃবিনিময় ঘটে। এসব কারণেও সমাজে পরিবর্তন আসে।

বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তন : কোনো সমাজই স্থির নয়। প্রতিটি সমাজই পরিবর্তনশীল। বাংলাদেশের সমাজও পরিবর্তিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সমাজে দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়েছে। শহুরে ও গ্রামীণ সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

শহুরে সমাজ : যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের ফলে শহরে শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমশ শিল্পভিত্তিক হয়ে পড়ছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যোগাযোগ বাড়ছে। শহরের লোকসংখ্যা বাড়ছে। শহর সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। জীবন ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে।

গ্রামীণ সমাজ : শহুরে সমাজের পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশের গ্রামেও বিস্তার লাভ করছে। একদিন গ্রাম বাংলার সমাজ জীবন ছিল সহজ সরল। জীবন ব্যবস্থা ছিল কৃষিভিত্তিক। গ্রাম ছিল বহুলাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের সচেতনতা বেড়েছে। এর ফলে গ্রামের মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। গ্রামের মানুষ এখন শহরমুখী ও পেশাজীবী হয়ে উঠছে। যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারে পরিণত হচ্ছে। গ্রামে শিক্ষার প্রসার হচ্ছে। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজে শহর সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে।

এছাড়াও বাংলাদেশের সমাজে দ্রুত অন্যান্য পরিবর্তন ঘটছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলছে। স্বাধীনতার পর রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশের সাথে সাথে সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে। বহির্বিপ্লবের সাথে যোগাযোগ প্রসারিত হওয়ার ফলে এদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ভিন্ন সংস্কৃতির সর্ম্মিশ্রণ ঘটছে।

এছাড়া সমাজে মূল্যবোধগত পরিবর্তন আসায় শহরে ও গ্রামে মহিলারা বিভিন্ন পেশা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন। এতে মহিলা সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। তারা তাদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

বর্তমান বিশ্বে পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন রকম পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

সামাজিক গতিশীলতা : সামাজিক গতিশীলতার প্রক্রিয়া বলতে একটি বিশেষ পদ্ধতি বা কার্যক্রম বোঝায়। এ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি সমাজের এক পদমর্যাদা থেকে অন্য পদমর্যাদায় পদার্পণ করে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তি সমাজের উচ্চপদস্থানে আসীন হতে পারে আবার পদস্থান হারিয়ে নিচেও নামতে পারে। মোট কথা সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক গতিশীলতা। যখন ব্যক্তি বা দল একটি সামাজিক মর্যাদা থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি বা মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে অন্য সামাজিক মর্যাদায় চলে যায় তখন তাকে সামাজিক গতিশীলতা বলে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে উচ্চ শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণী। সম্পদ, ক্ষমতা, বংশমর্যাদা, পেশা, শিক্ষা এসবের ভিত্তিতে সমাজে স্তরবিভাগ দেখা যায়। মানুষের এ স্তর বিভাগ চিরস্থায়ী নয়। এ স্তর পরিবর্তনের ফলে উচ্চস্তরের মানুষ নিম্নস্তরে, আবার নিম্নস্তরের মানুষ উচ্চস্তরে যেতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তনকেও সামাজিক গতিশীলতা বলা হয়।

সামাজিক গতি উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী উভয়ই হতে পারে। কেউ সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে আবার কারও সামাজিক মর্যাদা লোপ পায়।

সামাজিক গতিশীলতার কারণসমূহ : সামাজিক গতিশীলতার পেছনে কয়েকটি কারণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ কারণগুলো হচ্ছে— (১) শিল্পায়নের প্রভাব, (২) নগরায়ণের প্রভাব, (৩) শিক্ষার হার বৃদ্ধি, (৪) সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং (৫) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন।

নিম্নে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল :

শিল্পায়নের প্রভাব : সাধারণ অর্থে শিল্পায়ন বলতে কলকারখানা স্থাপন ও সেগুলোর প্রসার লাভকে বোঝায়। শিল্পায়ন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদিত হয়। আধুনিক সমাজ বলতে সাধারণত শিল্পায়িত সমাজকেই বোঝায়। শিল্পায়ন মানেই সভ্যতার অগ্রগতি। শিল্পায়নের প্রভাবে মানুষের অর্থনৈতিক মান বেড়ে যায়। সমাজে ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটলে মানুষ কৃষিভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা রাখতে পারে না। শিল্পভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায় তার অনুপ্রবেশ ঘটে। এতে তার পেশা, আয়, মূল্যবোধ ইত্যাদিতে পরিবর্তন ঘটে। এভাবে শিল্পায়নের মাধ্যমে সামাজিক গতিশীলতা বাড়ে।

নগরায়ণের প্রভাব : শিল্পায়নের সাথে নগরায়ণের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। নগরায়ণ হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নগরের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে। নগর বলতে এমন একটি সীমিত এলাকা বোঝায় যেখানকার জনগোষ্ঠী অকৃষিজ পেশা বা কাজকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

নগরায়ণের ফলে মানুষ ক্রমাগত গ্রাম থেকে নগরের দিকে ধাবিত হয়। মানুষের মনে নগর মানসিকতা গড়ে ওঠে। নগরে বসবাসকারী মানুষের জীবন প্রণালি গ্রামীণ জীবন প্রণালি থেকে ভিন্নতর। নগর মানসিকতা নগরবাসীর কাজ-কর্মে, আচরণে-চিন্তায়, এককথায় মূল্যবোধে পরিবর্তন ঘটায়। বিভিন্ন পেশার সুযোগ থাকায় নগরবাসীদের আর্থ সামাজিক তথা মর্যাদাগত পরিবর্তন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এভাবে সামাজিক গতিশীলতা বাড়ে।

স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি : শিক্ষা এমন একটি পদ্ধতি যা মানুষের মানবিক গুণাবলির উৎকর্ষ বাড়ায়। সাথে সাথে শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটায় এবং দক্ষতা বাড়ায়। সমাজে শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে মানুষের মনে নতুন নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক সচেতনতা বাড়ে। শিক্ষিত সমাজের প্রত্যাশা উন্নত ও ভিন্ন। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এসে বসবাস করে, বিশেষ করে গ্রাম থেকে শহরে এসে বাস করে। এক পেশা বা মর্যাদা থেকে অন্য পেশা বা মর্যাদায় তাদের উত্তরণ ঘটে। এভাবে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক গতিশীলতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন : সমাজ ব্যবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থার অনবরত পরিবর্তন ঘটছে। এ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আচরণবিধি, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায়, মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথেই সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এভাবে সামাজিক গতিশীলতা বাড়ায়।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন : মূলত উৎপাদন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পৃথিবীর সব সভ্যতাই শক্তিশালী আর্থিক বুন্যিাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সভ্যতার আদিপর্বে কৃষি এবং ব্যবসা ছিল অর্থনীতির মূলভিত্তি। তখন উৎপাদন পদ্ধতিতে পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে গোষ্ঠী মালিকানা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থাও সমাজে বেশিদিন স্থায়ী ছিল না। এক সময় আবার ক্ষমতামূলক ব্যক্তি বা নেতার অধীনে দাস নির্ভর উৎপাদন পদ্ধতি চালু হয়। দাসরা ছিল উৎপাদনের হাতিয়ার এবং তাদের প্রভুর সম্পত্তি। দাসদের বিদ্রোহের ফলে দাস সমাজ ভেঙে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়।

সামন্তপ্রভু ভূমি দাসদের দ্বারা ভূমি চাষ করাত, সামন্তপ্রভু ছিল ভূমির মালিক। সামন্ততন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানার ফলে ব্যক্তির হাতে পুঁজি সম্ভিত হতে থাকে এবং পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের হাতিয়ার ব্যক্তি মালিকানাধীন। এ ব্যবস্থায় সম্পত্তির অসম বণ্টনের ফলে সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতের ফলে কোনো কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের এ পর্যায়গুলো সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল। এর মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিত্যনতুন প্রযুক্তির ব্যবহার। প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে চলেছে। ফলে সমাজে নতুন নতুন পেশা সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানুষের জীবনযাত্রা অধিকতর গতিশীল হয়ে উঠছে।

পল্লী ও শহর সমাজে গতিশীলতা : শহর ও গ্রামে গতিশীলতার রূপ ভিন্ন। শহরে শিক্ষিত, ধনী, চাকরিজীবী ও শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ বাস করে। এখানে পেশা বদলের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ফলে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে শহরের জীবন কর্মচঞ্চল। এ চঞ্চলতার মাঝে কেউ টিকে থাকছে, আবার কেউ তলিয়ে যাচ্ছে। এ গতিশীলতার সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তনের গতিও বেড়ে চলেছে। পল্লী সমাজে শহরের মতো এতটা কর্মব্যস্ততা দেখা যায় না। এখানে সামাজিক গতিশীলতা শহরের তুলনায় অনেক ধীর। গ্রামীণ জীবনে বংশমর্যাদা, ধনদৌলত বা সম্পত্তি সামাজিক গতিশীলতায় প্রভাব বিস্তার করে। অভিজাত বংশের কেউ বিস্ত্রহীন হয়ে পড়লেও তার মান মর্যাদা সম্পূর্ণ লোপ পায় না। আবার সাধারণ পরিবারের কেউ সম্পদশালী হলেও তেমন মান মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। তবে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার ঘটায় এখন মানুষ বংশমর্যাদার পরিবর্তে অর্জিত মর্যাদাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এর ফলে পল্লী সমাজেও সামাজিক গতিশীলতার প্রক্রিয়া ক্রমে জোরদার হচ্ছে।

বাংলাদেশে সামাজিক গতিশীলতা : আধুনিক যুগ হচ্ছে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের যুগ। শিল্পের প্রসারের সাথে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের গতিও বেড়েছে। শিল্পের এ অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের সমাজও এগিয়ে চলেছে। এদেশের শহর নগর বন্দরে গড়ে উঠছে শিল্প কারখানা। যান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে প্রাচীন কৃষি পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি হচ্ছে। পেশাগত মর্যাদার সাথে সাথে শিক্ষার প্রসার হচ্ছে। মানুষ পল্লী ছেড়ে ভিড় করছে শহর বন্দরে। সে সাথে গ্রাম সমাজের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও সামাজিক প্রথাও লোপ পাচ্ছে।

এদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেমন— জমিদারি ব্যবস্থা বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে বংশগত মর্যাদার পরিবর্তে মানুষের শিক্ষা, পেশাগত মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সমাজে মান, সম্মান, অভিজাত্য ও যশ বাড়চ্ছে। ফলে পল্লী এলাকায় আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন হচ্ছে। এসব বিবেচনা করে বলা যায় বাংলাদেশেও সামাজিক গতিশীলতা ক্রিয়াশীল রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গতিশীলতার কারণ ও হারেও পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে।

আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য : প্রাচীন যুগের তুলনায় আধুনিক সমাজের রূপ ও প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা এখন শুধু বিজ্ঞানের যুগেই বাস করছি না, মহাশূন্য বিজ্ঞান যুগেও প্রবেশ করেছি। জ্ঞান বিজ্ঞানের বহুমুখী আবিষ্কার এবং তার ব্যবহারে মানুষের সমাজ জীবনে অব্যাহত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে আধুনিক যুগে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার স্থলে শহরকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়েছে। শিল্পের বিপুল অগ্রগতি, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, প্রযুক্তির ব্যবহার আধুনিক সমাজে এনেছে যন্ত্রনির্ভরতা। এ জন্যে আজকের সমাজ কাঠামোকে যান্ত্রিক সমাজ বলা হয়। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আজ প্রতিযোগিতা চলছে। আধুনিক সমাজের মানুষ আত্মসচেতন। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মান-মর্যাদাবোধ বেড়েছে। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অগ্রগতি, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাকে বিশ্ব সমাজের রূপ পরিগ্রহে সহায়তা করেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনাবোধের উন্নয়ন আধুনিক সমাজের মূলভিত্তি। এ রাজনৈতিক চেতনাবোধ কালক্রমে জাতীয়তাবোধে রূপলাভ করেছে। আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করেছে। আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যুক্তিবাদিতা। আধুনিক সমাজ যুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আধুনিক সমাজে অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সুদূর প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। পূর্বে মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসারের ফলে মানুষ তার ভাগ্যের ভার নিজ হাতে তুলে নিয়েছে। মানুষ বুঝতে পেরেছে যে সে আর প্রকৃতির হাতের পুতুল নয়। মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে। এভাবে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ করে জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

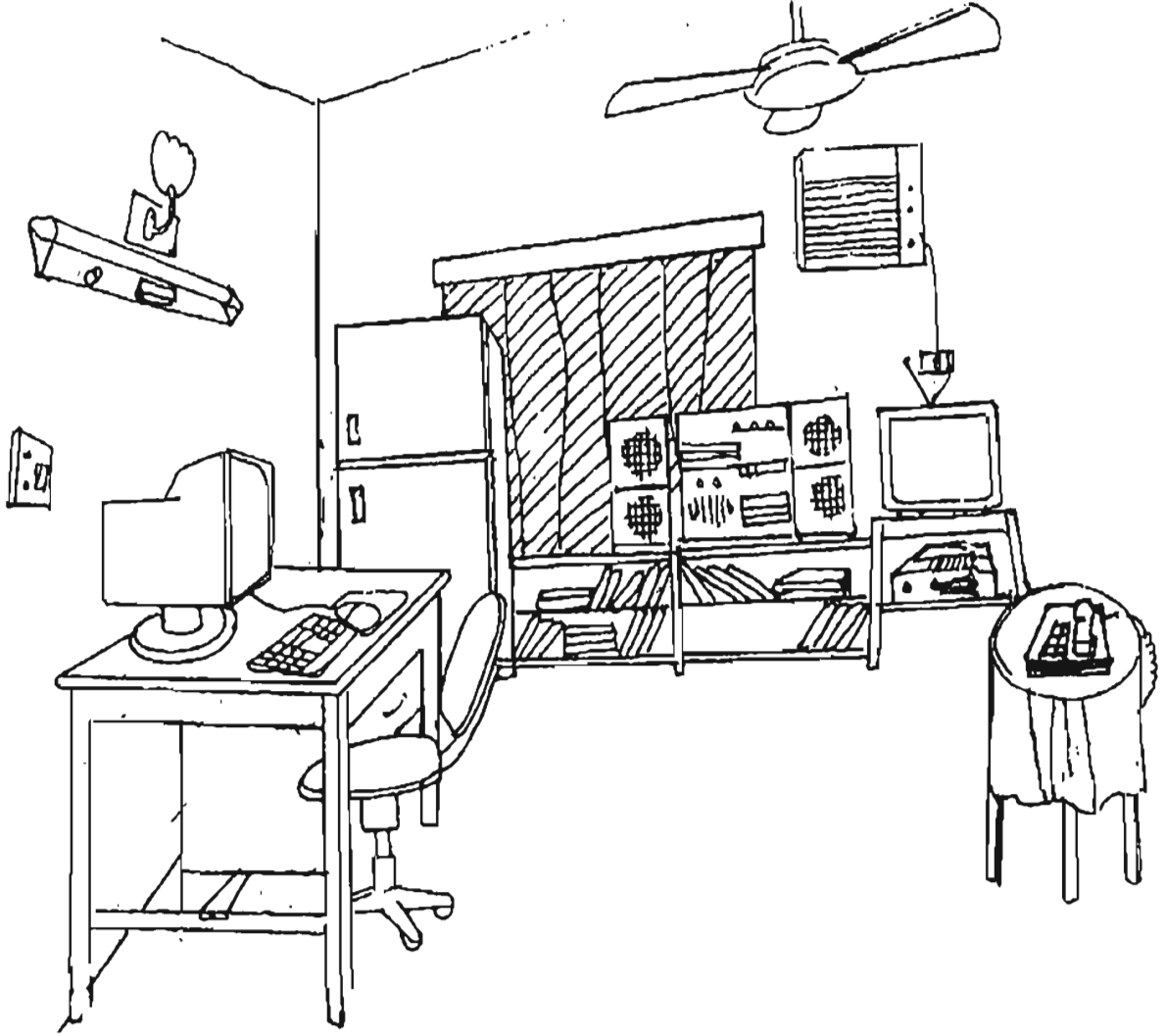
জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার : আধুনিক সমাজ গঠনের পেছনে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিভিন্ন চিন্তাবিদ, মনীষী ও বিজ্ঞানীদের শিক্ষা, চিন্তা ও মেধায় মানব সভ্যতায় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটেছে। প্রাচীনকালে প্লেটো, এরিস্টটল, টলেমি, আর্কিমিডিস প্রমুখের চিন্তা ও আবিষ্কার সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশে অনন্য অবদান রেখেছে। মধ্যযুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা স্থবির ছিল। আবার ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। এ যুগকে রেনেসাঁ যুগ বলে অভিহিত করা হয়।



চিত্র ৫ : লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)

এ যুগে ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। ইতালির চিত্র শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এ যুগের মানুষ। তিনি একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চায় সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। রেনেসাঁ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ছাড়াও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছে। আধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসার ঘটান ফলে উৎপাদনের হার বিপুলভাবে বেড়ে যায় এবং সমাজে নবযুগের সৃষ্টি হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ আজ যে কোনো আবিষ্কারকে বিশ্বের সবার দ্বারে পৌঁছে দিচ্ছে। তাই চন্দ্র বিজয়ের সাফল্য সমগ্র মানব জাতির সাফল্য বলে স্বীকার করা হয়। আধুনিক সমাজে নানা ভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞান এখন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। যেমন কলা, বাগিচা, বিজ্ঞান প্রভৃতি।

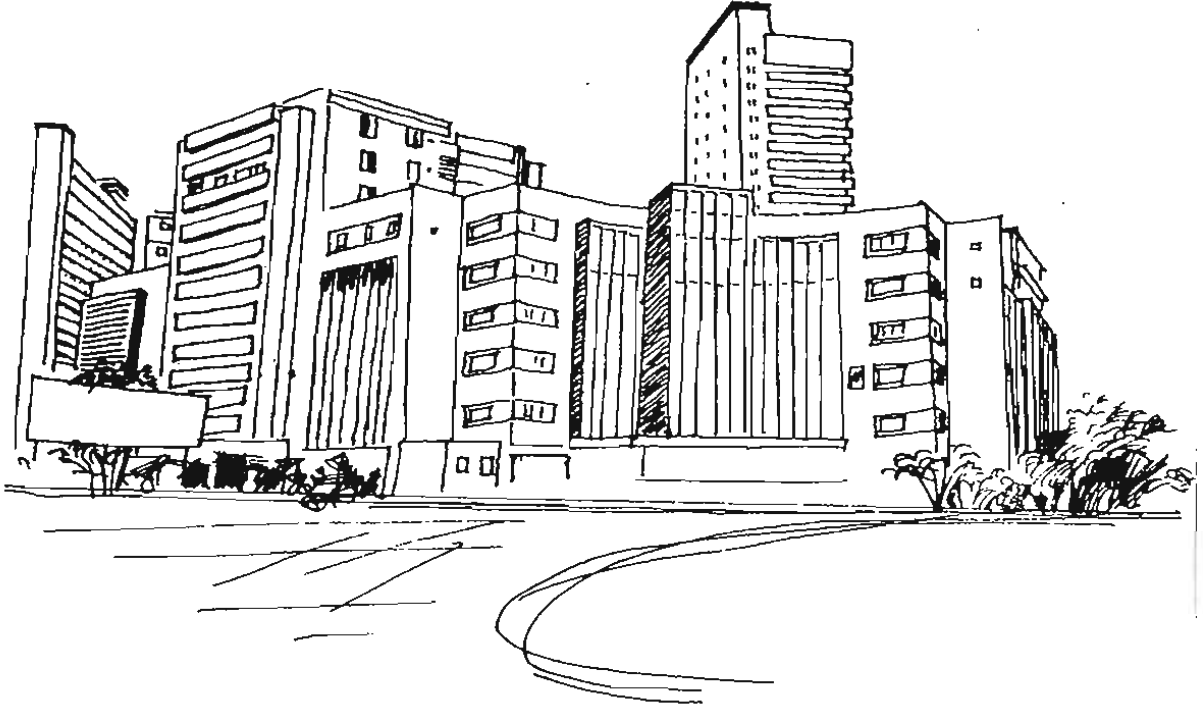
ছাপাখানার সাহায্যে জ্ঞান আজ সহজে অন্যের দ্বারে পৌঁছে যাচ্ছে। বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান চর্চার উপকরণ দ্রুত প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জ্ঞানকে দূর-দুরান্তে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জল, স্বপ্ন ও আকাশ পথে যোগাযোগের উন্নতি হচ্ছে এতে বিভিন্ন জাতির মাঝে জ্ঞান বিজ্ঞানের আদান-প্রদান দ্রুত ও সহজ হচ্ছে।



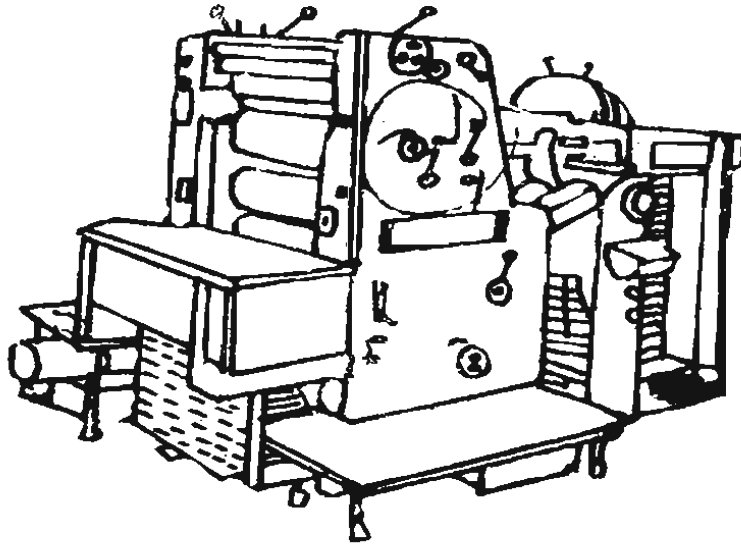
চিত্র ৬ : দৈনন্দিন জীবনের যন্ত্রপাতি

দৈনন্দিন জীবনে যন্ত্রপাতির ব্যবহার : দৈনন্দিন জীবনে যন্ত্রপাতির ব্যবহার আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যন্ত্রপাতির বহুল প্রচলন ও ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, রেডিও, টিভি, ফ্রিজ, টেলিফোন ইত্যাদি আজ মানুষের নিত্য ব্যবহারের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ হয়ে এসেছে এবং নিত্যদিনের কাজে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। এছাড়া দৈনন্দিন যাতায়াত ও পরিবহণে মানুষ স্থলপথে বাস, ট্রাক, জীপ, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, জলপথে জাহাজ, লঞ্চ, স্টিমার ইত্যাদি ব্যবহার করছে। আকাশপথে বিমান ব্যবহার করছে। মানুষ জমিতে কলের লাঙল, ফসল কাটা ও ফসল মাড়ানোর মেশিন এবং পানি সেচের পাম্প ব্যবহার করছে।

চিকিৎসা : নতুন নতুন কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি আধুনিক সমাজে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ ও সহজতর করেছে। এজরে, আলট্রাসোনোগ্রাফি মানব দেহের ভেতরের ছবি তুলে রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। রেডিয়াম চিকিৎসায় ব্যবহার হচ্ছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র রোগির রক্ত, মলমূত্র পরীক্ষার কাজে ব্যবহার হচ্ছে। বিভিন্ন ওষুধ আবিষ্কার, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি চিকিৎসাকে সহজ করে মানুষের অধিক আয়ু এবং সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা বিধান করেছে।



চিত্র ৭ : বহুতল অটালিকা



চিত্র ৮ : মুদ্রণ যন্ত্র

সংবাদ মাধ্যম : ছাপাখানার উন্নতির ফলে মানুষের চিন্তা চেতনার খবর দ্রুত দেশ বিদেশে পৌঁছাচ্ছে। টিভি, বেতারের মারফত খবর, শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান শোনা ও দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট রয়েছে দ্রুত খবর সরবরাহের জন্য। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অতিদ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য বর্তমানে ফ্যাক্স, ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া অফিস আদালতে টাইপ রাইটার, ফটোকপিয়ার ও টেলিপ্রিন্টার, ফোন, ফ্যাক্স মেশিন, কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্রেনের সাহায্যে বড় বড় দালান কোঠা বা বহুতল অটালিকা তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন তলায় ওঠার জন্য লিফট ব্যবহার হচ্ছে। আধুনিক সমাজে সর্বত্রই আজ বিজ্ঞানের কলাকৌশল মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায়—
 i সমাজ কাঠামোর গঠন পরিবর্তন
 ii মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন
 iii বিশেষ কোনো উপাদানের পরিবর্তন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

২. মধ্যযুগে সমাজের পরিবর্তন বলতে বুঝা যেত—

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ক. পরকালের জন্য প্রস্তুতি | খ. জীবনের চলমান অগ্রগতি |
| গ. সুখী জীবনযাপনের প্রস্তুতি | ঘ. অর্থনৈতিক অবস্থার অগ্রগতি |

৩. সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি কী—

- | | |
|-------------|-------------------|
| ক. অর্থনীতি | খ. ভৌগোলিক পরিবেশ |
| গ. জনসংখ্যা | ঘ. শিক্ষা |

৪. মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধিত হয়—

- i শিক্ষার মাধ্যমে
 ii শিল্পায়নের প্রভাবে
 iii সামাজিক গতিশীলতার মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫ - ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

গণি মিয়া একজন বৃদ্ধ কৃষক। সে দাওয়ায় বসে চিন্তা করছিল তাদের সময়ে যদি আজকের প্রযুক্তি থাকত তাহলে তারা আরও বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারত এবং তাদের জীবনযাত্রার মানও অনেক উন্নত হত।

৫. বিদ্যুৎ কে আবিষ্কার করেন ?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. ফ্যারাডে | খ. আর্করাইট |
| গ. জেমস ওয়াট | ঘ. গ্রাহাম বেল |

৬. গণি মিয়ার এ ধরনের চিন্তার পেছনে কাজ করছিল—

- i হতাশা
 ii জীবনযাত্রার মান
 iii উচ্চাকাঙ্ক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

৭. আধুনিক প্রযুক্তি জীবনকে—

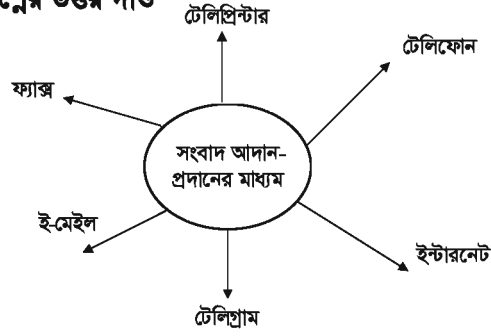
- i গতিশীল করে
 ii স্বাচ্ছন্দ্যময় করে
 iii শহরমুখী করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
গ. iii

- খ. ii
ঘ. i ও ii

নিচের ছকটি দেখ এবং ৮-৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও



৮. অতিদ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে—

- ক. ফ্যাক্স, টেলিপ্রিন্টার ও টেলিফোন
গ. ফ্যাক্স, ই-মেইল ও ইন্টারনেট

- খ. টেলিপ্রিন্টার, টেলিফোন ও ইন্টারনেট
ঘ. টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও ই-মেইল

৯. কোন্টি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন ?

- ক. ফ্যাক্স
গ. টেলিগ্রাম

- খ. টেলিফোন
ঘ. টেলিপ্রিন্টার

১০. কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়—

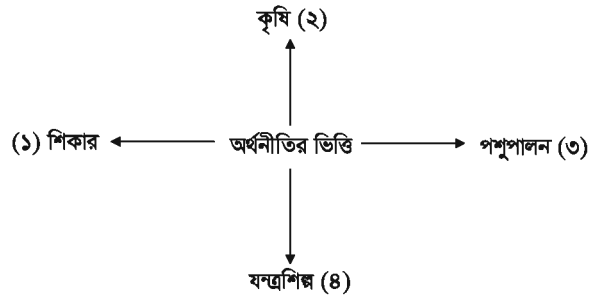
- i ইন্টারনেট ব্যবহার করতে
ii ই-মেইল করতে
iii ফ্যাক্স করতে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
গ. i ও iii

- খ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের ডায়াগ্রামটি দেখ এবং ১১-১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:



১১. সভ্যতার আদিপর্বে অর্থনীতির মূলভিত্তি কী ছিল ?

- ক. পশুপালন
গ. কৃষি

- খ. শিকার
ঘ. যন্ত্রশিল্প

১২. কোনটি দ্বারা প্রভাবিত সমাজকে শিল্পায়িত সমাজ বলা হয় ?

- ক. শিকার
গ. পশুপালন

- খ. কৃষি
ঘ. যন্ত্রশিল্প

১৩. অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর মানুষের জীবনযাত্রায়—

- গতিশীলতা আসে
- স্থবিরতা আসে
- ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে।

তুলনামূলক বিচারে চিত্রের ৪ নং ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

- কুতুবউদ্দিনের শৈশব ও কৈশোর গ্রামে কেটেছে। তিনি যৌথ পরিবারে বসবাস করতেন। পরিবারের সমবয়সী সদস্যদের নিয়ে বাড়ির আঙিনায় কিংবা খোলা মাঠে খেলাধুলা করে তিনি নির্মল আনন্দ পেতেন। তাদের পরিবার কৃষি জমির ফসলের ওপর নির্ভর করত। গ্রামের জীবন ছিল সহজ সরল। শিক্ষা লাভের পর তিনি ঐ গ্রাম্যজীবন ছেড়ে চাকরির জন্য শহরে আসেন। চাকরি লাভের পর তিনি শহরে বসবাস করতে থাকেন। এর কয়েক বছর পর ছুটিতে তিনি নিজ গ্রামে বেড়াতে এসে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষার হার, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখতে পান। তিনি লক্ষ করেন, কতগুলো পরিবারের সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে।
ক. পূর্বে গ্রামবাংলার জীবন ব্যবস্থা কীরূপ ছিল ?
খ. কুতুবউদ্দিনের গ্রামের সমাজ পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্ণনা কর।
গ. কুতুবউদ্দিনের গ্রামের গতিশীলতার সাথে শহর সমাজের গতিশীলতার তুলনামূলক চিত্র ব্যাখ্যা কর।
ঘ. কুতুবউদ্দিনের গ্রামের কিছু পরিবারের মর্যাদার পরিবর্তনে কোন উপাদানটির ভূমিকা বেশি ছিল? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
- জসিমউদ্দিন গ্রামে বাস করে। সেখানে তাদের বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম রেডিও টেলিভিশন। প্রয়োজনের তাগিদে শহরে তার ভাইয়ের বাসায় এসে এর চাকচিক্য দেখে অবাক হয়ে গেল। সেখানে তার ভাইয়ের বাচ্চারা বাইরের মাঠে না খেলে ঘরে কম্পিউটার খেলে। তারা ভালো স্কুলে পড়ে। আধুনিক যুগের আবিষ্কৃত সকল প্রযুক্তি তাদের ঘরে আছে।
ক. কোথায় সামাজিক গতিশীলতা বেশি ?
খ. সামাজিক পরিবর্তনের দুইটি কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. জসিমউদ্দিনের গ্রামের বাড়ি ও তার ভাইয়ের শহরের বাসার তুলনামূলক পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর।
ঘ. প্রযুক্তির উন্নতি সামাজিক গতিশীলতাকে বৃদ্ধি করে এ বক্তব্য সম্পর্কে যুক্তি দেখাও।
- আদিমকালে মানুষ কাঁধে পিঠে মালামাল বহন করত। এতে অনেক সময় ব্যয় হত। এ সময় কমানোর ভাবনা থেকে চাকা আবিষ্কৃত হয়। চাকার গাড়ির পাশাপাশি পানি পথে যোগাযোগ ও পরিবহণে নৌকা আবিষ্কৃত হয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর জল ও স্থলপথে পরিবহণে পরিবর্তন আসে। উড়োজাহাজ আবিষ্কার যোগাযোগ ও পরিবহনের কাজ আরও দ্রুততর করে। সংবাদপত্র, রেডিও এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিকস মাধ্যম তথ্য ও ভাবের প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে জ্ঞানের প্রসার ঘটায়।
ক. চাকার ওপর তৈরি গাড়ি কীসের সাহায্যে টেনে নেওয়া হত ?
খ. চাকার গাড়ি ও নৌকায় মালামাল বহন কেন সমস্যাজনক ছিল ?
গ. রেডিও এবং টেলিভিশন কীভাবে জ্ঞানের প্রসার ঘটায় তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনে কোন মাধ্যমটির ভূমিকা অধিক? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
- মি. হাসান ও রিমা উভয়ই সরকারি চাকরির শেষপ্রাপ্ত। তাদের একমাত্র সন্তান সজীব গত বৎসর লেখাপড়া শেষ করে একটি বিদেশি সংস্থায় চাকরি করছে। সজীবের অফিসে সবাই কম্পিউটার ব্যবহার করে। মি. হাসান ও রিমা তাদের চাকরির প্রথম দিককার কথা মনে করেন—কত কষ্ট করে একটি চিঠি টাইপ করতে হতো! টেলিভিশন—চাকরি জীবনের মাঝামাঝি এসে কিনেছিলেন! আর সজীব ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন দেশের টিভি চ্যানেল দেখে অভ্যস্ত। সজীবের আচরণেও তারা টেলিভিশনে দেখা অনুষ্ঠানের ছাপ লক্ষ করেন।
ক. সামাজিক পরিবর্তন কী ?
খ. সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ বর্ণনা কর।
গ. সজীবের আচরণ কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. টেলিভিশন সামাজিক পরিবর্তনের একটি অন্যতম মাধ্যম—বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশ ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মধ্যযুগে আরবদেশীয় বণিকগণ উপমহাদেশের পণ্যদ্রব্য ইটালির ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি বন্দরে চালান করত। এ সকল বন্দর থেকে পণ্যদ্রব্য আবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠান হত। ইটালীয় ও আরব বণিকদের মধ্যে এ বাণিজ্য ছিল প্রায় একচেটিয়া। এতে তাদের প্রচুর মুনাফা হত। ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বণিকগণ উপমহাদেশে আসার জলপথ আবিষ্কার করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। এজন্য তারা বহুদিন ধরেই চেষ্টা করে আসছিল। অবশেষে পর্তুগালের নাবিক ভাস্কা-ডা-গামা ১৪৯৮ সালে কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন। কালিকট উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। ভাস্কা-ডা-গামা আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার নতুন জলপথ আবিষ্কার করেন। সুয়েজ খাল খননের পূর্ব পর্যন্ত এ জলপথই ইউরোপীয় বণিকগণ ব্যবহার করত। ধীরে ধীরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকগণ ভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সাথে ব্যবসায়ের লিপ্ত হয়।



ভাস্কা-ডা-গামা (আনুমানিক ১৪৬৯-১৫২৫)

উপমহাদেশে পর্তুগীজদের আগমন : পর্তুগালের লোকদের বলা হয় পর্তুগীজ। ভাস্কা-ডা-গামার নতুন জলপথ আবিষ্কারের অল্প দিনের মধ্যেই পর্তুগীজ বণিকগণ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থলে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে।

তাদের এ সকল কুঠির মধ্যে কালিকট, চৌল, বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই), সালাসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ ইত্যাদি ছিল প্রধান। পশ্চিম বাংলার হুগলিতেও তারা কুঠি স্থাপন করে। শ্রীলঙ্কার কয়েকটি স্থানেও তাদের কুঠি স্থাপিত হয়।

আলবুকার্ক : ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলোর প্রথম গভর্নর ছিলেন আলবুকার্ক। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় পর্তুগীজগণ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নৌশক্তিতে পরিণত হয়। তিনি কোচিনে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এ দুর্গটিই ভারতে প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ।

পর্তুগীজ বণিকদের কার্যক্রম : ভারতের সাথে সাথে পর্তুগীজ বণিকগণ একই সময়ে চীন, মালাক্কা, মালদ্বীপ, ব্রুনাই, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশেও যাতায়াত করত। এ সকল দেশ থেকে তারা বাদাম, মসলা, রং, কড়ি, কর্পূর ইত্যাদি ভারতে আমদানি করত। তারা বাংলাদেশ তথা ভারত থেকে সুতি ও রেশমি কাপড়, তামাক, চামড়া, চাল, ডাল, ঘি, তেল, মধু, মোম ইত্যাদি অন্যান্য দেশে রপ্তানি করত।

বাণিজ্যের পাশাপাশি তারা বাংলার বার ভূঁইয়া বা বড় বড় ভূস্বামীদের সেনাবাহিনীতেও চাকরি করত। ইসা খাঁ, কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনীতে বহু পর্তুগীজ সৈনিক ছিল। এদেশের জনগণের ওপর তারা নানা ধরনের অত্যাচার করত। বহু হিন্দু-মুসলমান বালক-বালিকাকে তারা বলপূর্বক খ্রিস্টান করেছিল। পর্তুগীজগণ বাংলাদেশে ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত। পর্তুগীজ জলদস্যুদের বলা হত হার্মাদ। বহু নর-নারীকে ধরে নিয়ে তারা দাস-দাসী হিসেবে বিভিন্ন দেশে বিক্রি করত।

পর্তুগীজদের দমন : পর্তুগীজদের অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠলে সম্রাট শাহজাহান তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশে বাংলার সুবাদার কাসিম খান তাদেরকে হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সুবাদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ দখল করেন। তিনি পর্তুগীজদেরকে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন।

বাংলায় পর্তুগীজদের অবদান : পর্তুগীজগণ বাংলাদেশে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছে। আমাদের দেশের সুস্বাদু ফল আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, জলপাই, কামরাঙ্গা প্রভৃতির চাষ পর্তুগীজরাই শুরু করে। এদেশের নানা ফলমূল থেকে চাটনি ও দুধ থেকে মিষ্টি মিঠাই তৈরিতে এরা অনন্য অবদান রাখে। বাংলা ভাষার উন্নয়নেও তারা অবদান রাখে। অনেক পর্তুগীজ শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকে যায়— যেমন বালতি, ছবি, সাবান, তোয়ালে, আলপিন, বারান্দা, জানালা, কেদারা প্রভৃতি। বাংলা গদ্যে প্রথম বই পর্তুগীজদের লেখা। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ এবং অভিধানও তাদেরই রচনা। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্যই তারা বাংলা ভাষার চর্চা করেছিল।

ওলন্দাজদের আগমন : ইল্যান্ডের অধিবাসীগণ ডাচ বা ওলন্দাজ নামে পরিচিত। তারা পর্তুগীজদের দেখাদেখি ভারতে আসে। উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য করা। এ উদ্দেশ্যে তারা ১৬০২ সালে ‘ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ নামে একটি বাণিজ্য-সংঘ করে। তারা মাদ্রাজের নাগাপট্টম এবং পশ্চিম বঙ্গের চুঁচুড়া ও বাকুড়ায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। এছাড়া বালেশ্বর, কাশিমবাজার, বরানগর প্রভৃতি স্থানেও তাদের কুঠি ছিল।

ওলন্দাজগণ উপমহাদেশ থেকে কাঁচা রেশমি সুতা, সুতিকাপড়, চাল, ডাল, তামাক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করত। মসলার ব্যবসাতে তারাই ছিল শ্রেষ্ঠ। প্রথমে পর্তুগীজ এবং পরে ইংরেজগণ ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অবশেষে তারা এদেশ থেকে চলে যায় এবং ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে।

দিনেমারদের আগমন : ডেনমার্কের লোকদের বলা হয় ‘ডেনিশ’ বা দিনেমার। তারা বাণিজ্য করার জন্য ১৬১৬ সালে ‘ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে এদেশে আসে। তাদের বাণিজ্যকুঠি ছিল তাজপোরের ট্রাঙ্কুবার এবং পশ্চিম বাংলার শ্রীরামপুরে। কিন্তু তারা বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। অবশেষে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজদের নিকট বাণিজ্যকুঠি বিক্রি করে তারা এদেশ ছেড়ে চলে যায়।

ইংরেজদের আগমন : ইল্যান্ডের ২১৭ জন অংশীদার ১৬০০ সালে একটি বণিকসংঘ গঠন করে। তারা এর নাম দেয় ‘ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’। ইল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের কাছ থেকে তারা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসা করার সনদ লাভ করে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে তারা সুরাটে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করার অনুমতি লাভ করে (১৬১২ সাল)। পরে মসলিপট্টমে তাদের দ্বিতীয় বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয় (১৬১৬ সাল)। একে একে তারা আগ্রা, আহমদাবাদ, ভারুচ প্রভৃতি স্থানেও কুঠি স্থাপন করে। তারা ১৬৩৯ সালে মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) ফোর্ট সেন্ট জর্জ নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। ইংরেজগণ হরিহরপুর, হুগলি, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানেও কুঠি স্থাপন করে। বাংলার সুবাদার শাহ সুজা বছরে তিন হাজার টাকা শুল্ক দেওয়ার শর্তে ইংরেজদেরকে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি দেন।

ইল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজার বোনকে বিয়ে করে যৌতুক হিসেবে বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) শহরটি লাভ করেন (১৬৬৯ সাল)। তিনি ইংরেজ কোম্পানির নিকট শহরটি ইজারা দেন। পরে কোম্পানি এটি কিনে নেয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইংরেজগণ সূতানুটি গ্রামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করে (১৬৯০ সালে)। পরে কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম দুটি কিনে নগরটিকে আরো বড় করা হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে বিখ্যাত কলকাতা শহর। মাদ্রাজ, বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে ভারতে ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা দারুণ প্রসার লাভ করে। ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখশিয়ারের কাছ থেকে শুল্ক ছাড়াই ইংরেজগণ সারা ভারতে বাণিজ্য করার অধিকার পায়।

ফরাসিদের আগমন : ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে উপমহাদেশে সকলের শেষে ব্যবসা করার জন্য আসে ফরাসিগণ। ১৬৬৪ সালে তারা ‘ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে। ধীরে ধীরে তারা সুরাট, পন্ডিচেরি, চন্দননগর, মাহে, কারিকল, মসলিপট্টম, বালেশ্বর, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। তারা প্রায় ১০০ বছর এদেশে বাণিজ্য করে। তারা বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। পন্ডিচেরিতে তাদের একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল।

ইংরেজদের সাথে দ্বন্দ্ব : প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ইংরেজদের সাথে ফরাসিদের প্রতিযোগিতা ছিল। নানা কারণে ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে অনেকগুলো যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের রেশ ধরেই ভারতেও এ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা ১৭৫৭ সালে ফরাসিদের নিকট থেকে চন্দননগর এবং ১৭৬০ সালে পন্ডিচেরি কেড়ে নেয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়ের ফলে বাংলার ওপর ইংরেজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারত থেকে ফরাসিদের বিদায় : ১৭৬৩ সালে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ফরাসিগণ তাদের হারানো কুঠি ও দুর্গ ফিরে পেলেও ভারতে তারা আর কোনো দিন প্রাধান্য স্থাপন করতে পারেনি। অবশেষে ভারত থেকে তারা সরে পড়ে। ইংরেজদের উন্নততর নৌবাহিনী ফরাসিদের ব্যর্থতার মূল কারণ।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখন গঠিত হয় ?

ক. ১৬০০ সালে

খ. ১৬০২ সালে

গ. ১৬১৬ সালে

ঘ. ১৬৬৪ সালে

২. আল বুকাক এর চেষ্টায় পর্তুগীজগণ পরিণত হয় -

i. শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীতে।

ii. শ্রেষ্ঠ নৌশক্তিতে।

iii. জলদস্যুতে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ও ii

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ইউরোপীয় বণিকরা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করত। ব্যবসা করতে গিয়ে তারা ভারতে বেশ কিছু কুঠি স্থাপন করে। তবে এক সময় অনেককেই ব্যবসা বন্ধ করে ফিরে যেতে হয়।

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ - ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩. কোন পণ্য নিয়ে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ উভয়ে বাণিজ্য করে—

ক. মসলা, কাঁচা রেশমি সুতা

খ. চাল, ডাল

গ. বাদাম, তামাক

ঘ. বাদাম, রং

৪. কোন দুর্গটি ভারতে ১ম ইউরোপীয় দুর্গ ?

ক. কালিকট

খ. পাটনা

গ. কোচিন

ঘ. সুরাট

৫. পর্তুগীজদের বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ –

i. এখানে ব্যবসায় মন্দাভাব

ii. ইংরেজদের কাছে পরাজয়

iii. বাংলা থেকে বিতাড়ণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

বণিক সংঘ	দুর্গ	পণ্য সামগ্রী
আরব বণিক, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসি,	কালিকট, বেসিন, নাগাপট্টম, চুচুড়া, হুগলি, পাটনা, চন্দননগর, সুরাট	বাদাম, মসলা, চাল, রং, কাঁচা রেশমি সূতা, ডাল, তামাক

ক. প্রথম কোন ইউরোপীয় বণিকগণ উপমহাদেশে আগমন করে ?

খ. ছকে উল্লেখিত যে কোনো একটি বণিক শ্রেণীর উপমহাদেশে আগমনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. ছকে উল্লেখিত তথ্য হতে বর্ণিত শ্রেণীর সাথে তাদের নির্মিত দুর্গের নাম ও তাদের ব্যবসা-
সংশ্লিষ্ট পণ্যের নামের একটি তথ্য ছক আকারে উপস্থাপন কর।

ঘ. বাংলাদেশের খাদ্য ও ভাষার ক্ষেত্রে পর্তুগীজদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ— মতামত দাও।

তৃতীয় অধ্যায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা

বাংলা ভাষা ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে বাণিজ্য করতে আসে এদেশে। ধীরে ধীরে শক্তি বাড়তে থাকে তারা ফলে, বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে তাদের বিরোধ বাড়ে। এরই পথ ধরে সংঘটিত হয় পলাশীর যুদ্ধ। যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা যে শক্তি সঞ্চয় করে পরবর্তী সময় বকসারের যুদ্ধে মীর কাসিমকে পরাজিত করে তা আরও সংহত করা হয়। এভাবে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা প্রায় নিশ্চিত হয়। এদেশে নিজেদের ক্ষমতা সু প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকগণ রাজস্ব আদায়ের ভার অর্থাৎ দিওয়ানি লাভ করে। শাসন পরিচালনার দায়িত্ব থাকে নবাবের ওপর। এ ধরনের বৈত-শাসন প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয় ইংরেজরা। বর্তমান অধ্যায়ে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার এ সমস্ত ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিরাজ-উদ-দৌলা ও পলাশী যুদ্ধ

সিরাজ-উদ-দৌলার পরিচয় : সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। তিনি ছিলেন নবাব আলীবর্দী খানের দৌহিত্র। নবাব আলীবর্দীর কোনো পুত্র-সন্তান ছিল না। তিনি তাঁর তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বড় ভাই হাজী আহমদের তিন ছেলের সাথে। ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের বিয়ে হয়েছিল জয়েনউদ্দীনের সাথে। সিরাজ ছিলেন জয়েনউদ্দীন ও আমিনা বেগমের বড় ছেলে। সিরাজকে তাঁর মাতামহ আলীবর্দী খান খুবই ভালবাসতেন।

সিংহাসন লাভ : ১৭৫৬ সালের ১০ই এপ্রিল আলীবর্দী খানের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সিরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বান। ফলে সিরাজ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। সিরাজ সিংহাসনে বসায় তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরা অনেকেই ঈর্ষান্বিত হন। খামাত ভাই শওকত জং ছিলেন তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর বড় খালা ঘসেটি বেগম শওকত জং-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। সিরাজ শওকত জং-কে পূর্ণিয়ার যুদ্ধে পরাজিত করেন। তিনি ঘসেটি বেগমকেও নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হন।



নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা (১৭৩৩-১৭৫৭)

ইংরেজদের সাথে বিরোধ : সিংহাসন লাভের অল্পকাল পরেই ইংরেজদের সাথে সিরাজ-উদ-দৌলার বিরোধ বাড়ে। এ বিরোধের পেছনে কতকগুলো কারণ ছিল। প্রথমত, সিরাজ-উদ-দৌলা সিংহাসনে বসলে রেওয়াজ অনুযায়ী ইংরেজরা তাঁকে কোনো উপঢৌকন পাঠায়নি। দ্বিতীয়ত, ইংরেজরা সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতিদ্বন্দ্বী ঘসেটি বেগম ও পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জং-কে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তৃতীয়ত, রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস

নবাবের বিরাগভাজন হয়ে কলকাতায় পালিয়ে গেলে ইংরেজরা তাকে সাদরে আশ্রয় দেয়। চতুর্থত, কোম্পানির কর্মচারীরা বাণিজ্যিক বিশেষ সুবিধাসমূহের যথেষ্ট অপব্যবহার করছিল। পঞ্চমত, ইংরেজরা কলকাতায় এবং ফরাসিরা চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ শুরু করলে সিরাজ-উদ-দৌলা তাদেরকে দুর্গ নির্মাণের কাজ বন্ধ করার আদেশ দেন। ফরাসি বণিকেরা তাঁর আদেশ মেনে নেয়। কিন্তু ইংরেজরা তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করে দুর্গ নির্মাণের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এ সব কারণে সিরাজ-উদ-দৌলা ইংরেজদের সমুচিত শাস্তি দেওয়ার জন্য কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদেরকে শহর থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি কলকাতার নতুন নাম দেন আলীনগর। অতঃপর আলীনগরের (কলকাতার) শাসনভার মানিক চাঁদের ওপর ন্যস্ত করে তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।

কলকাতা পতনের খবর মাদ্রাজে পৌঁছলে সেখানকার কর্তৃপক্ষ কলকাতা পুনর্দখল করার জন্য রবার্ট ক্লাইভ ও নৌ সেনাপতি ওয়াটসনকে পাঠান। এদিকে কলকাতা অধিকৃত হওয়ায় দেশীয় স্বার্থান্বেষী বণিক সম্প্রদায় প্রমাদ গুণতে শুরু করে। তারা কলকাতা থেকে বিতাড়িত এবং ফলতায় অবস্থানরত ইংরেজদের সাথে গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। অন্যদিকে ইংরেজরাও কলকাতার অধিকর্তা মানিকচাঁদ, ধনাঢ্য বণিক উমিচাঁদ, ব্যাংকার জগৎশেঠ প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে হাত করে ফেলে। এমতাবস্থায় ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলকাতা পুনরুদ্ধার করতে এলে বিশ্বাসঘাতক মানিক চাঁদ তাদেরকে বাধা না দিয়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে যান। ফলে ক্লাইভ ও ওয়াটসন প্রায় বিনা যুদ্ধেই কলকাতা পুনর্দখল করে নিতে সক্ষম হন। এ সংবাদ পেয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা পুনরায় কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন বিরাজমান পরিস্থিতি- যেমন তাঁর সেনাপতির বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ, আহমদ শাহ আবদালী কর্তৃক বিহার আক্রমণের সম্ভাবনা ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে তিনি ইংরেজদের সাথে সন্ধি করেন। এ সন্ধি আলীনগরের সন্ধি নামে পরিচিত। সন্ধির শর্তানুযায়ী সিরাজ-উদ-দৌলা ইংরেজদেরকে অনেক ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন। তাদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধাদিও বাড়িয়ে দেন। বিনিময়ে ইংরেজগণ নবাবের সাথে শত্রুতা করবেন না বলে অঙ্গীকার করে।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র : ইংরেজদের সাথে সন্ধি স্থাপিত হলেও রবার্ট ক্লাইভ কখনও সিরাজ-উদ-দৌলাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি সিরাজ-ফরাসি জোটের আশঙ্কায় সিরাজ-উদ-দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সচেষ্ট হন। অপরদিকে এ সময়ে মুর্শিদাবাদ দরবারে নবাবের বিরোধী দল জগৎশেঠের মনোনীত প্রার্থী মীর জাফরকে নবাবী দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র চলছিল। রবার্ট ক্লাইভ মীর জাফরকে সমর্থন করে ইংরেজদের স্বার্থে এ ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

পলাশীর যুদ্ধ : আলীনগরের সন্ধি স্বাক্ষরের মাত্র আড়াই মাস পরেই ইংরেজরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গা করে। তারা ফরাসিদের চন্দননগর কুঠি দখল করে নেয়। এরপর ষড়যন্ত্র অনুযায়ী ক্লাইভ তার সেনাবাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন। নবাবও তাদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হন। মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সেনা সমাবেশ করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মীর জাফর, ইয়ার লতিফ ও রায়দুর্লভের সৈন্যগণ যুদ্ধ না করে দাঁড়িয়ে থাকে। মীরমদন, মোহনলাল ও ফরাসি সেনানায়ক সিনফ্রে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। ইংরেজ বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। হঠাৎ একটা গোলার আঘাতে মীরমদনের মৃত্যু হয়। মীরমদনের মৃত্যুতে নবাব খুব ভেঙ্গে পড়েন। তিনি মীর জাফরকে তাঁর শিবিরে ডেকে পাঠান। মীর জাফর তাঁর সামনে হাজির হলে তিনি তাঁর নিকট কাতরভাবে সাহায্য চান। মীর জাফর নবাবকে সেদিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ করার পরামর্শ দেন। নবাব তাঁর পরামর্শ মতো যুদ্ধ বন্ধ করে ভুল করলেন। যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দেওয়ায় নবাবের সৈন্যগণ তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিল। এ সুযোগে ক্লাইভ নবাব বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। হঠাৎ আক্রমণে নবাবের সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। তারা এদিকে-ওদিকে পালাতে লাগল। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব পরাজিত হন।

সিরাজের হত্যা : নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন। তিনি স্থির করলেন পাটনা যাবেন। সেখানে সৈন্য সংগ্রহ করে আবার যুদ্ধ করবেন। কিন্তু পথে রাজমহলের কাছে তিনি ধরা পড়েন। তাঁকে বন্দি করে মুর্শিদাবাদ নিয়ে আসা হয়। মীর জাফরের পুত্র মীরনের আদেশে মোহম্মদী বেগ নামক একজন ঘাতক নবাবকে হত্যা করে। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলা ও বাংলার জনগণকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল : পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের সাহায্যে মীর জাফর বাংলার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নামে মাত্র নবাব। প্রকৃত ক্ষমতা চলে গিয়েছিল ইংরেজদের

হাতে। দ্বিতীয়ত, পলাশীর যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ এলাকা সম্প্রসারিত হয় এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। তৃতীয়ত, প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে গেলে কোম্পানির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, পলাশীর যুদ্ধ দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ-ফরাসি সংঘর্ষকে প্রভাবিত করে। এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা বাংলার ধন-সম্পদ লাভ করে আর্থিক দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইংরেজদের এ আর্থিক সম্বলতাই তাদেরকে তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধে ফরাসিদেরকে পরাজিত করতে বহুলাংশে সাহায্য করে। পঞ্চমত, এ যুদ্ধের ফলে বাংলা স্বাধীনতা হারায় এবং উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়।

সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের কারণ : সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের জন্য দায়ী ছিলেন তাঁর সেনাপতি মীর জাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, জগৎশেঠ, দিউয়ান রাজবল্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। কারণ তারাই যড়যন্ত্র করে নবাবকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তবে তাঁর পরাজয়ের জন্য তিনি নিজেও কিছুটা দায়ী ছিলেন। তিনি পরিস্থিতি মোকাবিলায় দৃঢ়চিত্তের পরিচয় দিতে পারেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন বাংলার পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে ছিল না। সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতিতে সমাজ জীবন তখন ছিল কলুষিত। সে সময়ে কাউকেই বিশ্বাস করার পরিবেশ ছিল না। বাংলার এহেন পরিবেশে অভিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও কতটুকু সাফল্য লাভ করতে পারতেন, তা বলা কঠিন ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মীর কাসিম ও বকসারের যুদ্ধ

পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত মীরজাফর নামেমাত্র নবাব ছিলেন। তিনি ইংরেজদের দাবি-দাওয়া মিটাতে না পারায় ইংরেজরা তাঁকে সরিয়ে তাঁর জামাতা মীর কাসিমকে ১৭৬০ সালে বাংলার নবাব করে। মীর কাসিম কোম্পানিকে দু'লাখ টাকা এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ছেড়ে দেন।

ইংরেজদের সাথে মীর কাসিমের বিরোধ : মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা। তিনি ইংরেজদের প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করতে চাইলেন। তিনি নতুন সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। তাদের ইউরোপীয় কায়দায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। অর্থের অপচয় রোধ করেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে মুন্সেরে নিয়ে যান। তিনি জানতেন যে, ইংরেজদের সাথে তাঁর যুদ্ধ অনিবার্য। তাই তিনি সেভাবেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ইংরেজদের সাথে তাঁর যুদ্ধ বেধে গেল। যুদ্ধের কারণ ছিল ইংরেজদের অন্যায় আচরণ। শুল্ককে কেন্দ্র করে

ইংরেজদের সাথে নবাবের মনোমালিন্য শুরু হয়। দেশি ব্যবসায়ীদের শুল্ক দিতে হত। অন্যদিকে ইংরেজদের ব্যবসা করার জন্য কোনো শুল্ক দিতে হত না। তাই ব্যবসায়ের দু'পক্ষের প্রতিযোগিতা ছিল অসম। তদুপরি ইংরেজগণ অন্যায়ভাবে 'দস্তক' নামক ছাড়পত্র প্রদান করত। দস্তক দেখালে শুল্ক দিতে হত না। এর ফলে দেশি বণিকগণ দারুণ অসুবিধায় পড়ে যায়। তারা নবাবের নিকট অভিযোগ পেশ করতে লাগল। নবাব ইংরেজদেরকে অবৈধ দস্তক প্রদান বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা এ নির্দেশ মানল না। নবাব তখন শুল্ক একেবারেই তুলে দিলেন। এতে রাষ্ট্রীয় তহবিলের ক্ষতি হল, কিন্তু দেশি ব্যবসায়ীগণ হাফ ছেড়ে বাঁচল। ইংরেজরা নবাবের এ ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হল। তারা মীর কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। মীর জাফরকে তারা আবার মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসাল।



মীর কাসিম

মীর কাসিমের পরাজয় : মীর কাসিম পর পর কাটোয়া, ঘেরিয়া, উদয়নালা ও পাটনার যুদ্ধে পরাজিত হলেন। তিনি দেশ ছেড়ে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

বকসারের যুদ্ধ : মুঘল সম্রাট শাহ আলম এ সময় অযোধ্যার নবাবের আশ্রয়ে ছিলেন। মীর কাসিম সুজা-উদ-দৌলা ও শাহ আলমের কাছে সাহায্য চাইলেন। তাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। তিন পক্ষ একত্র হয়ে যুদ্ধ করল। ১৭৬৪ সালের ২২শে অক্টোবর বকসারে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়। এ যুদ্ধ জয়ের ফলে বাংলায় ইংরেজ শাসন আরো দৃঢ় হল। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বকসারের যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধের পর শাহ আলম ও সুজা-উদ-দৌলা ইংরেজদের সাথে সন্ধি করেন। মীর কাসিম নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বহু বছর অজ্ঞাত অবস্থায় থাকার পর ১৭৭৭ সালে দিল্লীর নিকটে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোম্পানির দিউয়ানি লাভ ও দ্বৈত শাসন

বকসারের যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ক্লাইভকে আবার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর করে পাঠান। ক্লাইভ এদেশে এসেই সুজা-উদ-দৌলার কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে সুজা-উদ-দৌলা কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা দিলেন। এছাড়া তিনি এলাহাবাদ ও কারা জেলা দুটিও কোম্পানিকে ছেড়ে দিলেন।

কোম্পানির দিউয়ানি লাভ : ক্লাইভ অতঃপর সম্রাট শাহ আলমের সাথে এলাহাবাদের চুক্তি করেন (১৭৬৫ সাল)। এ চুক্তি অনুসারে ক্লাইভ সম্রাটকে এলাহাবাদ ও কারা জেলা দুটি প্রদান করলেন। বিনিময়ে সম্রাট কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি প্রদান করলেন। মুঘল সরকারের ছিল দুটি ভাগ-নিয়ামত ও দিউয়ানি। সাধারণ শাসন ও আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়ামত, আর রাজস্বের দায়িত্বে ছিল দিউয়ানি বিভাগ। এলাহাবাদ চুক্তি অনুসারে শাসন বিভাগের দায়িত্ব রইল নবাবের হাতে, আর কোম্পানি লাভ করল রাজস্ব আদায়ের অধিকার। স্থির হল, কোম্পানি রাজস্ব আদায় করে মোট আয় থেকে সম্রাটকে দেবে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা, আর প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য নবাবকে দেবে ৫৩ লক্ষ টাকা। এ ব্যবস্থায় নবাবের ছিল ক্ষমতাহীন দায়িত্ব, আর কোম্পানি লাভ করল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। এ সময় বাংলার নবাব ছিলেন মীর জাফরের পুত্র নাজিম-উদ-দৌলা। তিনি ছিলেন নাবালক। তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত করা হয় মুহম্মদ রেজা খানকে। রেজা খান নবাবের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এ কারণে তাঁর উপাধি হয় নায়ের নাজিম।

দ্বৈত শাসন : কোম্পানি দিউয়ানি লাভ করল। কিন্তু রাজস্ব আদায় করার মতো দক্ষতা ও জনবল তখনো কোম্পানির ছিল না। তাছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ তখনো ইংরেজ কোম্পানিকে শুল্ক দিতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং ক্লাইভ এক অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এ ব্যবস্থায় রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল চিরাচরিত দেশীয় কর্মচারীদের ওপরেই। কোম্পানি শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করত। ক্লাইভ বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করলেন রেজা খানের ওপর, আর বিহারের রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব দিলেন সিতাব রায়ের হাতে। তাঁদের উপাধি দেওয়া হল ‘নায়ের দিউয়ান’। মুর্শিদাবাদ ছিল রেজা খানের কর্মস্থল, আর সিতাব রায়ের কর্মস্থল ছিল পাটনা। তাঁদের কাজ তদারক করার জন্য কোম্পানির এক জন প্রতিনিধি থাকতেন মুর্শিদাবাদে, আর এক জন থাকতেন পাটনায়। ক্লাইভের এ অভিনব ব্যবস্থাই দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় মুঘল শাসনের বাহ্যিক রূপ অটুট থাকে। যদিও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল কোম্পানির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

দ্বৈত-শাসনের কুফল : ক্লাইভ যত দিন কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর ছিলেন, তত দিন এ দ্বৈতশাসন মোটামুটি ভালোভাবেই চলেছিল। ১৭৬৭ সালে ক্লাইভ দেশে চলে যান। তিনি চলে যাওয়ার পর এ ব্যবস্থায় ফাটল ধরে। কোম্পানির কর্মচারি ও গোমস্তাদের লুটপাটের জন্য দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশবাসী অত্যাচার ও অনাচারের শিকার হয়। দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭৬৮-৬৯ সালে অনাবৃষ্টির কারণে

কৃষকেরা ফসল ফলাতে পারেনি। তাই ১৭৭০ সালে দেখা দেয় প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। কোম্পানির গোমস্তাগণ অধিক লাভের আশায় খাদ্যশস্য মজুদ করতে শুরু করে। সুতরাং খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষের রূপ নিল। অনুমান করা হয় যে, এ দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গিয়েছিল। বাংলা ১১৭৬ সনে এ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে একে বলা হয় ‘ছিয়াস্তরের মন্বন্তর’।

দ্বৈত শাসনের অবসান : ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে যে দ্বৈত শাসন এ মহাদুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী ছিল। ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসনের অবসান করা হয়। কোম্পানি দেশের প্রশাসনের দায়িত্ব সরাসরি নিজের হাতে তুলে নেয়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত সালে দ্বৈত শাসনের অবসান হয় ?

ক. ১৭৬৫

খ. ১৭৭০

গ. ১৭৭২

ঘ. ১৭৭৫

২. খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষে রূপ নিল কারণ—

i কৃষকগণ ফসল ফলাতে পারেনি

ii কোম্পানি গোমস্তাদের খাদ্যশস্য মজুদ করার জন্য

iii গোমস্তাদের লুটপাটের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii



চিত্র:

প্রদত্ত চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩. ওপরের চিত্রে প্রদত্ত ছবিটি কোন নবাবের ?

ক. সিরাজ-উদ-দৌলা

খ. মীর জাফর

গ. মীর কাসিম

ঘ. আলীবর্দী খান

৪. তাঁর শাসন কালের অন্যতম পদক্ষেপ হচ্ছে—

i. অবৈধ দস্তক প্রদান বন্ধের নির্দেশ

ii. দ্বৈত শাসন প্রবর্তন

iii. মুজোরে রাজধানী স্থানান্তর

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিটিভিতে সাহেরা সিরাজ-উদ-দৌলার নাটক দেখছিল। নাটকে বিভিন্ন দৃশ্যের এক পর্যায়ে সাহেরা দেখল বিভিন্ন রাজকর্মচারী ও সৈনিকগণের অসহযোগিতায় নবাব যুদ্ধে পরাজিত হলেন। বাংলায় ভিনদেশি শাসনের সূত্রপাত হয়। নবাবের পরাজয়ে সাহেরা মর্মান্বিত হয়।
 - ক. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কোন যুদ্ধে পরাজিত হন?
 - খ. উক্ত যুদ্ধে বিভিন্ন রাজকর্মচারী কেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে অসহযোগিতা করেছিল? ব্যাখ্যা কর।
 - গ. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ে সাহেরার মর্মান্বিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. বাংলায় ভিনদেশি শাসনের সুদূরপ্রসারী ফলাফল কী ছিল বলে তুমি মনে কর?
২. শাহানার দাদা ব্রিটিশদের রাজকর্মচারী ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে রবার্ট ক্লাইভ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করে। শাহানা তার মায়ের কাছে ব্রিটিশ শাসনের সময়কার অনেক ঘটনা শুনছে। তখন বাংলা ১১৭৬ সন। বাংলায় হয়েছিল এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। শাহানার দাদারা ৭ ভাই বোন ছিলেন। পর পর দুবছর খরা হওয়ায় কৃষি উৎপাদন প্রায় বন্ধ ছিল। এই দুর্ভিক্ষে তাদের ৭ ভাই বোনের ৪ জন মারা যায়। তৎকালীন বাংলার অর্থনীতি প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। ব্রিটিশদের নীতির কারণে বাংলায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষের অকাল মৃত্যু হয়।
 - ক. ১১৭৬ সনের দুর্ভিক্ষকে কী বলা হয় ?
 - খ. দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের প্রধান কারণ ব্যাখ্যা কর।
 - গ. শাহানার দাদার ঘটনার আলোকে উক্ত দুর্ভিক্ষের সময়কার ঘটনার বর্ণনা কর।
 - ঘ. তৎকালীন বাংলার অর্থনীতি ভেঙে পড়ার ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন কতটুকু দায়ী বলে তুমি মনে কর ?

চতুর্থ অধ্যায়

ইংরেজ শাসনের প্রভাব

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ইংরেজ শাসনের যাত্রা শুরু করে। অচিরেই এই বিদেশি শাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত হয় এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে। ইংরেজ সরকার ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে জমিদারদের সাথে বিভিন্ন রকম বন্দোবস্ত গ্রহণ করে। যার পথ ধরে প্রবর্তিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এ বন্দোবস্তের সুফল-কুফল দুই-ই ভোগ করে এদেশবাসী। ইংরেজ শাসনের মাধ্যমেই বিদেশের সাথে যোগাযোগের পথ তৈরি হয়। এদেশের মানুষ এভাবে সংস্কৃত, ফার্সি পাশাপাশি ইংরেজি শেখার সুযোগ লাভ করে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতি নতুন চেতনা লাভ করে। বর্তমান অধ্যায়ে এ সব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও এর প্রভাব

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি : ১৭৭২ সালে কোম্পানির সরকার বাংলার দিউয়ানি শাসন সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ইজারাদারদের সাথে পাঁচ বছর মেয়াদি চুক্তি করেন। এর ফলে নব্য ধনী ফটকাবাজেরা প্রাচীন জমিদারদের চেয়ে বেশি নিলাম ডেকে ইজারা লাভ করে। তারা অধিক লাভের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে খুশিমতো রাজস্ব আদায় করত। ফলে প্রজাদের ওপর খুব অত্যাচার হয়। হেস্টিংস তাই পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে ইজারাদারি ব্যবস্থা তুলে দেন। এরপর জমিদারদের সাথে এক সন্য বন্দোবস্ত করা হয়। যে সকল জমিদার এক সন্য বন্দোবস্ত গ্রহণ করেনি, তাদের জমিদারি ইজারাদারদের সাথে বন্দোবস্ত করা হয়। সুতরাং অনিয়ম ও অত্যাচার রয়েছেই গেল। অবস্থার উন্নতির জন্য ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি আইন পাস করে। এ আইন কলকাতা কর্তৃপক্ষকে একটি স্থায়ী ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য নির্দেশ দেয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য : ব্রিটিশ সরকার মনে করত যে, ভূমি ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব এলে জমিদারগণ ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করবে। জমিদারগণ জমির উন্নয়ন করবে। ফলে কৃষিতে উৎপাদন বাড়বে এবং দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধিশালী হবে। জমিদারগণ সুবিধা ভোগ করবে। বিনিময়ে তারা সরকারের প্রতি অনুগত থাকবে। অনুগত জমিদারগণ হবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন : ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। তাঁর ওপর নির্দেশ ছিল ভূমি ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী আইন প্রবর্তন করার। কর্নওয়ালিস ১৭৮৯-৯০ সালে জমিদারদের সাথে একটি দশ সন্য বন্দোবস্ত করেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ (বোর্ড অব ডাইরেক্টরস) তাঁর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিকল্পনা অনুমোদন করলে এ দশ সন্য বন্দোবস্তকেই চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হবে। বোর্ড অব ডাইরেক্টরস ১৭৯২ সালে তার পরিকল্পনা অনুমোদন করে। ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ কর্নওয়ালিস দশ সন্য বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গৃহীত ব্যবস্থা : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির ওপর জমিদারের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রায়তেরা হয় তার প্রজা। মালিক হিসেবে জমিদার জমি বিক্রি করতে, দান করতে বা যে কোনো কাজে ব্যবহারের অধিকার লাভ করল। দশ সন্য বন্দোবস্তকালে জমিদারদের ওপর যে রাজস্ব ধার্য হয়েছিল তা চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হল। তবে রাজস্ব কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে পরিশোধ করতে হত। কোনো জমিদার নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে তার জমি নিলামে বিক্রি করে রাজস্ব আদায় করা হত। নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে রাজস্ব পরিশোধের বিধান ছিল বলে এই আইন সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত। জমিদারদের হাতে বিচার ও পুলিশী ক্ষমতা রইল না। তারা ভূমি-রাজস্ব ছাড়া আর কোনো প্রকার শুল্ক আদায় করতে পারত না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। এর সুফল ও কুফল দুই-ই পরিলক্ষিত হয়।

সুফল : কৃষিক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। জমিদারগণ নিজেদের আয় বাড়ানোর জন্য অনেক পতিত জমি কৃষকদের মধ্যে পত্তন দেয়। ফলে মোট আবাদী জমির পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ কৃষি সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে জমিদারদের আয়ও বেড়ে যায়।

জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হওয়ায় কোম্পানির সরকার আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। সুতরাং সরকারের বাজেট তৈরিতে সুবিধা হয়।

এ বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ ব্রিটিশ সরকারের নির্ভরযোগ্য সমর্থক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল।

ধনী জমিদারগণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। জমিদারদের অনেকেই পুকুর, দীঘি ও খাল খনন, বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল স্থাপন করেছেন। তারা নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার আনন্দ-উৎসব ও খেলাধুলায় উৎসাহ যুগিয়েছেন।

কুফল : জমি জরিপ না করে রাজস্ব নির্ধারণ করায় কোনো কোনো জমিদারির রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল জমির পরিমাণ অপেক্ষা বেশি। আবার কোনো কোনো জমিদারির রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল জমির পরিমাণ অপেক্ষা কম। সুতরাং রাজস্ব নির্ধারণের হার সুষ্ঠু ছিল না। যে সব জমিদার উচ্চ হারে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হল তাদের জমি অচিরেই সূর্যাস্ত আইনের অধীনে নিলামে বিক্রয় হয়ে যায়। তবে অধিকাংশ জমিদার ছিল সচ্ছল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের অবস্থার উন্নতি হলেও প্রজাদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। জমিদারগণ প্রজাদের ওপর ইচ্ছামতো খাজনা বাড়াতে পারত। জমিদারদের নায়েব-গোমস্তা এবং পাইক-পেয়াদারা প্রজাদের ওপর নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করত। সূর্যাস্ত আইন অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে সরকারের কোষাগারে রাজস্ব জমা দিতে না পারায় বহু প্রাচীন জমিদার বংশ তাদের জমিদারি হারায়। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল লোকজন অসহায় হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে নব্য ধনী ফটকাবাজেরা এ সকল জমিদারি কিনে নেয়। প্রজাদের প্রতি নতুন জমিদারদের কোনো দরদ ছিল না। ফলে প্রজারা নির্ধারিত হতে থাকে।

পরবর্তীকালে জমির দাম বহু গুণে বেড়ে গেলেও সরকার জমিদারদের ওপর রাজস্ব বাড়াতে পারেনি। সুতরাং সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার আয়করসহ প্রজাদের ওপর নানা প্রকার কর বসাতে শুরু করে।

জমিতে প্রজার কোনো অধিকার না থাকায় প্রজারা কৃষির উন্নয়নের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেনি। অনেক জমিদার গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমান। সুতরাং গ্রামগুলো অবহেলিত হতে থাকে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ম্যালেরিয়া, কুসংস্কার ইত্যাদিতে গ্রামগুলো জর্জরিত হতে থাকে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে অনেক গ্রাম উজাড় হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও এর প্রভাব

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হত মন্তুব, মাদ্রাসা ও টোলকে কেন্দ্র করে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রধানত ধর্মশাস্ত্র শেখানো হত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে জনসাধারণের পরিচয় ছিল না। ১৮১৩ সালে কোম্পানির সরকার ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ১ লক্ষ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ টাকা খরচ হত ভারতীয় ধারা তথা প্রাচ্য শিক্ষাদানের জন্য। এ সময় উইলিয়াম করি, ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায় ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন : ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করেন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক। তিনি ১৮৩৩ সালে শিক্ষা খাতের ১ লক্ষ টাকা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য খরচ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্তে ভারতে দুটি দলের উদ্ভব হয়। একদল প্রাচ্যভাষা শিক্ষার জন্য সরকারি অর্থ ব্যয়ের পক্ষপাতি ছিলেন। এ দলের প্রধান সমর্থক ছিলেন

সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত উইলসন। অপর দল পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন। এ দলের প্রধান সমর্থক ছিলেন গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন বিষয়ক সদস্য লর্ড মেকলে। বেকিথক শেখোক্ত দলের মত গ্রহণ করেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য সরকারি অর্থ মঞ্জুর করেন। লর্ড বেকিথকের চেষ্টায় ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বাই-এর এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হয়। এ সময় হতে ইংরেজি হয় উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম।

ইংরেজির প্রবর্তন : ১৮৩৭ সালে অফিস আদালতে ফার্সির বদলে ইংরেজি চালু হয়। ১৮৪৫ সালে সরকারি চাকরিতে ইংরেজি শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি প্রবর্তিত হয়।

সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন : পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার বেশ কিছু সরকারি স্কুল কলেজ স্থাপন করে। তবে সরকার বেশি নির্ভর করে বেসরকারি উদ্যোগের ওপর। জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের সাহায্যে দেশে অনেক স্কুল-কলেজ গড়ে ওঠে। শিক্ষার প্রসার উৎসাহিত করার জন্য যারা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করতেন সরকার তাঁদেরকে নানাভাবে সম্মানিত করতেন। সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তাঁদেরকে রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর, নবাব, রাজা, মহারাজা ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হত।

১৮৫৪ সালে শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশপত্র : ১৮৫৪ সালে চার্লস উড এদেশে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত একটা সুবিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। একে বলা হয় ‘উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচ’। এদেশের শিক্ষানীতি সম্পর্কে এ নির্দেশপত্রে বলা হয় “এদেশের সরকারি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হবে উন্নততর ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান-দর্শনের তথা ইউরোপীয় জ্ঞানের প্রসার।” এ নীতি অনুসারে প্রতি জেলায় একটি করে সরকারি জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্দেশপত্র অনুসারে লর্ড ডালহৌসি শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেথুন কলেজ। ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব : বাংলা তথা ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে হিন্দুগণ তা গ্রহণ করে। কিন্তু মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। হিন্দুগণ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়। তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, মুসলমানগণ প্রথমদিকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে।

হিন্দু সমাজে সচেতনতা ও সামাজিক সংস্কার : পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু সমাজে সংস্কার চিন্তা দেখা দেয়। হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তি সমাজকল্যাণ ও সংস্কারমূলক সভা সমিতি গঠন করে। তারা সাহিত্যপত্র, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে ও বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপন করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করায় তারা সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করে। হিন্দু সমাজে বেশ কয়েকজন সংস্কারক আবির্ভূত হন। এঁরা সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলনসহ অন্যান্য সংস্কারমূলক কাজে সরকারের সাথে সহযোগিতা করেন। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে অসামান্য অবদান রাখেন।

মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও অগ্রগতি : বিলম্বে হলেও মুসলিম সমাজের অনেক অগ্রগণ্য ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে। এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আমীর আলী। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলমানরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োগ লাভ করে। ধীরে ধীরে তাদের সামাজিক ও আর্থিক পশ্চাৎপদতা তারা কাটিয়ে উঠতে থাকে।

জাতীয়তাবাদের উদ্ভব : পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা তথা ভারতে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে। মিল, স্পেন্সার, বেন্থাম, বেকন, গিবন প্রভৃতি মনীষীদের রচনাবলি ও উদার দর্শন উপমহাদেশের জনগণকে প্রভাবিত করে। এর ফলে উপমহাদেশের বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও যুক্তিবাদের স্ফূরণ ঘটে। ফলে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক –

ক. লর্ড ক্লাইভ

খ. লর্ড ওয়েলেসলি

গ. লর্ড মেকলে

ঘ. লর্ড কর্নওয়ালিস

২. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে—

i. কৃষির সম্প্রসারণ ঘটে

ii. প্রজাদের অবস্থার উন্নতি হয়

iii. সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হলে হিন্দুরা একে স্বাগত জানালেও মুসলিমরা একে গ্রহণ করেনি। ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিকভাবে হিন্দুরা বিশেষ অগ্রগতি অর্জন করে।

৩. এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে—

i. হিন্দুদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে

ii. হিন্দুদের ওপর অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করেছিল

iii. হিন্দু মুসলিমদের ওপর একই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

৪. ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনকে মুসলমানেরা ভালোভাবে গ্রহণ করে না। কারণ তারা ছিল প্রধানত—

ক. খুবই ধর্মভীরু

খ. কুসংস্কারাচ্ছন্ন

গ. ইংরেজ বিদ্বেষী

ঘ. হিন্দু বিদ্বেষী

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মিনা ও সাধি দুই বান্ধবী। তারা তাদের স্কুল থেকে শিক্ষা সফরে ময়মনসিংহে রাজবাড়ি দেখতে গিয়েছিল। সেখানে প্রবেশ করতেই মিনার মনে পড়ে গেল পাঠ্যপুস্তকে পড়া প্রজাদের ওপর জমিদারদের অত্যাচারের কথা। মন খারাপ হয়ে গেল। সাধি বলল, “তবুও মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে।” মিনা বলল, “তুমি কী মনে কর এই ব্যবস্থা শুধু সুফল বয়ে এনেছিল। সাধি বলল তা নয়, তবে এ ব্যবস্থায় প্রজাদের চেয়ে জমিদাররা লাভবান হয়েছিল অনেক বেশি।”

ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কখন প্রবর্তিত হয় ?

খ. সূর্যাস্ত আইনের ব্যাখ্যা দাও।

গ. কীভাবে প্রজারা জমিদারদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল? বর্ণনা কর।

ঘ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধুমাত্র জমিদারদের জন্য সুফল বয়ে এনেছিল—বিশ্লেষণ কর।

২. আবরারের স্কুলের বার্ষিক মিলাদে হুজুর পবিত্র হাদিসের উদ্ধৃতি দিলেন “বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ”। এই উদ্ধৃতি শোনার পর ইতিহাস ক্লাসে আবরার তার শিক্ষকের কাছে জানতে চাইল মুসলমানেরা হাদিসের এই মহান বাণী জানার পরও কেন ভারতে শিক্ষা সংস্কৃতিতে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে ছিল? এর উত্তরে শিক্ষক বললেন, “ধর্মীয় গৌড়ামি এর পিছনে বড় অন্তরায় ছিল। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু সংস্কারক মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করেছেন।”

ক. ভারতে মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ অনুপ্রাণিত করেন এমন একজন মুসলিম সংস্কারকের নাম লিখ।

খ. পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পূর্বে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কীরূপ ছিল?

গ. কীভাবে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পরেছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ধর্মীয় গৌড়ামি ভারতে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতি প্রসারে বড় অন্তরায়—এই বক্তব্য তোমার মতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? মতামত দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

ইংরেজ শাসন ক্রমে এদেশের সমাজ ও মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে। ইংরেজদের শোষণ ও পীড়নের কারণে ধীরে ধীরে এদেশের মানুষ অধিকার সচেতন হয়। তারা জেগে উঠতে থাকে। আর এভাবেই নানা আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু হয়। সাথে সাথে এদেশের কতিপয় শিক্ষিত সচেতন মানুষ বুঝতে পারেন সমাজ জীবনে প্রচলিত নানা দুর্বলতা সংস্কারের মধ্যে দিয়ে দূর করতে হবে এবং মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তা হলেই সম্ভব হবে সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা। এ দৃষ্টিতেই বর্তমান অধ্যায়ে বাংলার জাগরণ এবং বাংলার সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলার জাগরণ

পলাশীর যুদ্ধে বাংলায় রাজনৈতিক ও সামাজিক নানাবিধ পরিবর্তন আসে। দেশবাসী এসব পরিবর্তন একেবারে নীরবে মেনে নেয়নি। রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীনও ছিল না। অবশ্য তখনও জাতীয়তাবাদী চেতনা দেখা দেয়নি। অর্থাৎ বাংলার সকল ধর্ম ও মতের মানুষ যে এক জাতি এবং একই দেশের অধিবাসী এমন ঐক্যবন্ধ চিন্তা তাদের হয়নি। ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশদের দোসর জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে যে সকল আন্দোলন সংঘটিত হয় সেগুলোর মধ্যে ফকির আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, ফরাজি আন্দোলন ও নীল বিদ্রোহ প্রধান। আমরা এখন এ সকল আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

(ক) ফকির আন্দোলন : আধুনিক শিক্ষার পূর্বে মুসলমান সমাজে জনগণের নেতা ছিলেন পীর, ফকির ও আলেমগণ। মুঘল আমলে এঁদেরকে নিষ্কর ভূমি দান করা হত। তাঁরা অবাধে ধর্মীয় কার্যকলাপ চালাতে পারতেন। তাই তাঁরা শান্ত ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এ নীতির পরিবর্তন করে। তাই ফকিরগণ বেশ কিছু ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত করেন। ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে এ সকল আন্দোলন সংঘটিত হয়।

ফকিরদের জীবনধারা : সে আমলে ফকিরগণ বিভিন্ন সংঘে বিভক্ত ছিলেন। একটি সংঘের সকল সদস্য এক সাথে এক তীর্থ থেকে অপর তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁরা সংসারী জীবনযাপন করতেন না। মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করে তাঁরা জীবন ধারণ করতেন। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাঁরা হালকা ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখতেন।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কারণ : ব্রিটিশ সরকার ফকিরদের অবাধ চলাচলে বাধা দেয়। তাঁদের মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাঁদের অস্ত্র বহন অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। এভাবে ফকিরদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। তাঁরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হন। এ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন ফকির মজনু শাহ।

ফকির আন্দোলনের উদ্দেশ্য : ফকিরদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল অবাধে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা। তাঁরা জাতীয়তাবোধে তেমন উদ্বুদ্ধ ছিলেন না।

ফকির আন্দোলনের ব্যাপ্তি : ফকিরগণ বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজদের বিভিন্ন কুঠি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। তবে উত্তরবঙ্গ ছিল তাঁদের আন্দোলনের মূল কেন্দ্র।

ফকিরদের দমন : ফকিরদের দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সৈন্য পাঠায়। কিন্তু ফকিরদের যুদ্ধের কৌশল ছিল অতর্কিত আক্রমণ ও পলায়ন। মজনু শাহকে ব্রিটিশরা পরাজিত করতে পারেনি। ১৭৮৭ সালে মজনু শাহের মৃত্যু হয়। এরপর ফকিরদের নেতৃত্ব দেন মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, সোবহান শাহ, মাদার বকস, করিম শাহ প্রমুখ ফকিরগণ। ১৮০০ সালের মধ্যে ফকিরগণকে চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়।

(খ) তিতুমীরের সংগ্রাম : তিতুমীরের সংগ্রাম সংঘটিত হয় কলকাতার অদূরে চব্বিশপরগনা জেলার বারাসাত মহকুমায়। তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলী। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন লাঠিয়াল। একবার এক ফৌজদারি মামলায় তাঁকে সাজা দেওয়া হয়। তাঁকে কারাবন্দি করা হয়। কারাজীবনের মেয়াদ শেষে তিনি মক্কায় হজ্জ করিতে যান। সেখানে তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্য হন। মক্কা থেকে ফেরার পর তিনি নারিকেলবাড়িয়ায় একটি খানকাহ বা গীরের আস্তানা স্থাপন করেন। তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদের ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করা শুরু করেন।

জমিদারদের সাথে সংঘর্ষ : এ অঞ্চলের জমিদারগণ প্রজাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করত। তিতুমীর এর প্রতিবাদ করেন। ফলে অচিরেই স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। এ স্থানীয় সংঘর্ষ থেকেই জন্ম নেয় ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম। তিতুমীর প্রতিপক্ষের জন্য নারিকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। তিতুমীরের দাপটে চব্বিশপরগনা ও নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।



তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)

তিতুমীরের দমন : এ সময় ইংরেজ সরকারের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক। তিতুমীরের দাপটের কথা তাঁর কানে পৌঁছালে তিনি তাঁকে দমনের জন্য কামান-গোলাবারুদসহ এক সৈন্যবাহিনী পাঠান। কামানের গোলায় তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত হয়। তিতুমীর পরাজিত হন। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। ১৮৩১ সালে ১৯শে নভেম্বর ৪০ জন সজীসহ তিতুমীর শহীদ হন। তাঁর বাহিনীর অধিনায়ক গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর প্রায় দেড়শ অনুচরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

তিতুমীরের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা : তিতুমীরের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। কিন্তু জাতীয় জীবনে এ সংগ্রামের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীকালে তিতুমীরের সংগ্রাম জনগণকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে।

(গ) ফরায়েজি আন্দোলন : ফরায়েজি আন্দোলন মূলত একটি সংস্কার আন্দোলন। এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন হাজী শরিয়তউল্লাহ। বর্তমান শরিয়তপুর জেলার শামাইল গ্রামের সাধারণ কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন হন। চাচার সংসারে তিনি লালিত পালিত হতে থাকেন। মাত্র তের বছর বয়সে তিনি বাড়ি ছেড়ে কলকাতা যান। তিনি হুগলির ফুরফুরা শরিফের মওলানা বাশারত আলীর শিষ্য হন। তাঁর সাথে তিনি হজ্জ করিতে মক্কা যান। মক্কায় তিনি দীর্ঘ ২০ বছর অতিবাহিত করার পর দেশে ফিরে ইসলামের বাণী প্রচার করা শুরু করেন।

তৎকালীন মুসলমানদের অবস্থা : তখন বাংলার মুসলমান সমাজে নানাপ্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। তারা খৎনা, বিয়ে ইত্যাদিতে নাচ গান, বাদ্য-বাদন করে অতিরিক্ত খরচ করত। তারা দরগায় শিরনি দিত, কবরে বাতি জ্বালাত এবং মহরম উপলক্ষে তাজিয়া মিছিল বের করত।

শরিয়তউল্লাহর গৃহীত ব্যবস্থা : শরিয়তউল্লাহ মুসলমানদের শরিয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি তাদেরকে ‘ফরজ’ অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য পালন করার তাগিদ দেন। আরবি ‘ফরজ’ শব্দ থেকেই ‘ফরায়েজি’ শব্দের উৎপত্তি। যারা ফরজ পালন করে তারাই ফরায়েজি। গরিব মানুষদের জন্য ফরজ মাত্র তিনটি—কলেমা, নামাজ ও রোজা। ধনীদের জন্য এ তিনটি ছাড়া যাকাত দেওয়া এবং হজ্জ করাও ফরজ। মুসলমান সমাজে কলু, জোলা ইত্যাদিকে ছোট জাত মনে করা হত। শরিয়তউল্লাহ বলেন, যে কোনো হালাল বুজিই সম্মানজনক। তিনি এ সকল লোককে ‘কারিগর’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি মনে করতেন যে, বিদেশি শাসনের অধীনে থাকা অবস্থায় মুসলমানদের জন্য ঈদের ও জুম্মার নামাজ অত্যাবশ্যকীয় নয়। তিনি বলেন, জমিদারগণ শুধু ভূমিকর আদায় করার অধিকারী। তিনি মুসলমানগণকে ভূমিকর ছাড়া জমিদারকে অন্য কোনো ধর্মীয় বা অন্য কোনো চাঁদা দিতে নিষেধ করেন।

শরিয়তউল্লাহর ওপর জমিদার ও বিরোধী মুসলমানগণ ক্ষেপে যায়। কিন্তু শরিয়তউল্লাহ তাদের সাথে কোনো রকম বিরোধিতায় যাননি। তিনি বরং মধ্যমপন্থা অনুসরণ করেন। তাঁর চেষ্টায় যশোর, ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা, বিক্রমপুর ও ময়মনসিংহের অনেক লোক ফরায়েজি মতবাদে বিশ্বাসী হয়। মুসলমান সমাজে প্রচলিত অনেক কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর হয়। মুসলমানদের অনেকেই সঠিক পথে ফিরে আসে। ১৮৪০ সালে হাজী শরিয়তউল্লাহর মৃত্যু হয়।

দুদু মিয়া : শরিয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র মুহসীনউদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইংরেজদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে তিনি যাননি। কিন্তু জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

খলিফা নিযুক্তি : দুদু মিয়া ‘গাও খলিফা’, ‘গির্দ খলিফা’ ইত্যাদি নিযুক্ত করেন। এ খলিফাগণ ফরায়েজিদের নিজেদের মধ্যে যদি কখনও ঝগড়া-বিবাদ লাগত তবে তা সালিশের মাধ্যমে মিটিয়ে দিতেন। এর ফলে ফরায়েজি অধ্যুষিত এলাকা থেকে কোর্ট-কাছারিতে মোকদ্দমা দায়ের এক রকম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা : অত্যাচারী জমিদার, জোতদার ও নীলকরগণ তাদের লাঠিয়াল বাহিনীর দ্বারা জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করত। এ অত্যাচার মোকাবেলার জন্য দুদু মিয়া পাল্টা লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে জমিদারদের সাথে তাঁর বাহিনীর কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে এমনভাবে দমন করেন যে, চাষিদের ওপর জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়।

দুদু মিয়ার মৃত্যু : ১৮৫৭ সালের সিপাহি যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে আটক করে। তাঁকে আলীপুর জেলহাজতে রাখা হয়। ১৮৬০ সালে তিনি মুক্তি পান। এরপর তিনি ঢাকার বংশাল রোডের একটি বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। এখানেই ১৮৬২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নয়া মিয়া ফরায়েজিদের নেতা হন। নয়া মিয়ার মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলন ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে যায়।

(ঘ) নীল বিদ্রোহ : ১৮৫৯-৬০ সালে বাংলায় নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। আঠারো শতকের শেষ দিকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটে। সেখানকার মিলগুলোতে সুতা ও কাপড় তৈরির জন্য নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। নীল গাছের ফল থেকে নীল রং তৈরি হত। ইংরেজরা তাই এদেশে নীলের চাষ শুরু করে। তারা জোর করে চাষিদের দিয়ে নীলের চাষ করাত। ১৮৩৩ সালের পর ইউরোপীয়গণ এদেশে জমির মালিক হওয়ার অধিকার লাভ করে। এর ফলে স্থানীয় জমিদারদের সাথে তাদের বিরোধ দেখা যায়। ইংরেজ সরকারি কর্মকর্তাগণ নীলকরদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করতেন। ফলে প্রজাদের ওপর তাদের অত্যাচারের কোনো সুরাহা হত না। দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল দর্পণ’ নাটকে আমরা নীলকরদের অত্যাচারের জীবন্ত চিত্র দেখতে পাই। নীলকরদের অত্যাচারের জন্য তাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

ইন্ডিগো কমিশন : ১৮৬০ সালে সরকার ‘ইন্ডিগো কমিশন’ গঠন করে। ‘নীল’-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘ইন্ডিগো’। কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিল নীলকরদের অত্যাচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখা। কমিশনের রিপোর্টে নীলচাষ ব্যবস্থার নিন্দা করা হয়। রিপোর্টে চাষিদের ওপর উৎপীড়ন বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

নীলকরদের অত্যাচারের অবসান : নীল বিদ্রোহের ফলে জনমত সৃষ্টি হয়। ফলে অত্যাচারের মাত্রা কমে আসে। ইতোমধ্যে ইউরোপে কৃত্রিম নীল রং উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়। ধীরে ধীরে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। চাষিরা অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়।

নীল বিদ্রোহের প্রভাব : নীল চাষিদের পক্ষে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমর্থন জানিয়েছিল। তৎকালীন সংবাদপত্রে এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়। এভাবে নীল বিদ্রোহ আমাদের জাতীয় চেতনা বিকাশে খুবই সহায়তা করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলায় সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় সংস্কার সাধিত হয়। এ সংস্কার আন্দোলনে কয়েক জন চিন্তাশীল ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে হাজী মুহম্মদ মুহসীন, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল জতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী অত্যন্ত বিখ্যাত। বর্তমান পরিচ্ছেদে তাঁদের সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(ক) হাজী মুহম্মদ মুহসীন : হাজী মুহম্মদ মুহসীন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন। ১৭৩২ সালে হুগলিতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম হাজী কয়েকউল্লাহ।

সম্পত্তি লাভ : মুহসীনের মায়ের পূর্বে একবার বিয়ে হয়েছিল। সেখানে তাঁর এক কন্যার জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল মুনুজান খানম। মুনুজান তাঁর পিতার অটল সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর সমুদয় সম্পত্তি তিনি মুহসীনকে উইল করে দেন। এভাবে মুহসীন প্রচুর সম্পদের মালিক হন।

মুহসীনের সরল জীবনযাপন : সম্পদের প্রতি মুহসীনের কোনো লোভ ছিল না। তিনি অতিশয় সাধারণ জীবনযাপন করতেন। বোনের নিকট থেকে পাওয়া অর্থ তিনি নিজে প্রয়োজনে ব্যয় করেননি। তিনি নিজে টুপি সেলাই ও কুরআন নকল করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। তিনি পবিত্র মকা থেকে হজ্ব করে আসেন।

মুহসীনের দানশীলতা : মুহসীন ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। কেউ তাঁর নিকট কোনো কিছু চেয়ে কোনো দিন বিমুখ হয়নি। বোনের নিকট থেকে পাওয়া সকল সম্পদ তিনি জনগণের কল্যাণে ব্যয় করেন। তিনি তাঁর সকল সম্পত্তি দান করে যান। তাঁর সম্পদের আয় থেকে ‘মুহসীন ফান্ড’ গঠন করা হয়। সে আমলের টাকায় এ ফান্ডের পরিমাণ ছিল প্রায় নয় লক্ষ টাকা। এ ফান্ডের টাকা দিয়ে হুগলি কলেজ ও হুগলির বিখ্যাত ইমামবাড়া নির্মিত ও পরিচালিত হয়। তাছাড়া এ অর্থ থেকে গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। বহু স্কুল কলেজকে এ টাকা থেকে সাহায্য করা হয়। প্রায় ৮০ বছর বয়সে হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মৃত্যু হয়। তিনি দানবীর হিসেবে পরিচিত।

(খ) রাজা রামমোহন রায় : ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার এক তালুকদার পরিবারে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপাণ্ডিত ছিলেন। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মে তাঁর বেশ দখল ছিল। তিনি হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তিনি সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন। তিনি একাধারে ধর্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষা-প্রসারক ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁকে প্রথম আধুনিক ভারতের স্বপতি আখ্যা দিয়েছিলেন।

ফর্ম-৫, সামাজিক বিজ্ঞান-৮ম



হাজী মুহম্মদ মুহসীন (১৭৩২-১৮১২)



রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

আত্মীয় সভা : রামমোহন রায় ছিলেন মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের প্রবর্তক। তিনি হিন্দু ধর্মে প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। ১৮১৫ সালে তিনি কলকাতায় ‘আত্মীয় সভা’ নামে একটি সমিতি গঠন করেন। কলকাতার অনেক অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এ সমিতির সদস্য ছিলেন।

ব্রাহ্ম সভা : ১৮২৮ সালে রামমোহন রায় ‘ব্রাহ্ম সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে একটা সমাজ গড়ে তোলেন। তাঁরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮৩০ সালে ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব উপাসনাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পরম সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারো উপাসনা করা ছিল নিষিদ্ধ।

রক্ষণশীলদের বিরোধিতা : হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ রামমোহন রায়ের কার্যাবলি ও লেখার কঠোর সমালোচনা করে। ঐদের মধ্যে রাখাকান্ত দেব ছিলেন প্রধান। তাঁরা ধর্ম সভা নামে একটি পাল্টা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার : রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারের চিন্তা করেন। তখন উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ কৌলিন্য প্রথার কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। অনেকে শতাধিক বিয়ে করত। সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। সমাজে আর একটা জঘন্য প্রথা ছিল জীবন্ত স্ত্রীকে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা। এ প্রথার নাম ছিল ‘সতীদাহ’। রামমোহন রায় এ সকল প্রথা দূর করার জন্য প্রয়াস চালান। ১৮২৯ সালে সারা ভারতে সতীদাহ আইনত নিষিদ্ধ হয়। সমকালীন হিন্দু সমাজ এ আইনের বিরোধিতা করলেও রামমোহন রায় এ আইনকে স্বাগত জানান।

শিক্ষা প্রসারে রামমোহন রায়ের ভূমিকা : রামমোহন রায় শিক্ষা বিস্তারেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন।

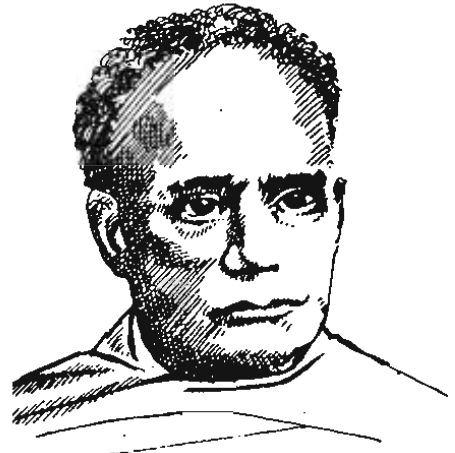
সংবাদপত্র প্রকাশ : রামমোহন রায় ‘সংবাদ কৌমুদী’ ও ‘মীরাত-উল-আখবার’ নামক দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

বিলেতে গমন : দিল্লীর নামেমাত্র সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁর দাবি-দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করার জন্য ১৮৩০ সালে রামমোহন রায়কে বিলেত পাঠান। এ উপলক্ষে সম্রাট তাঁকে ‘রাজা’ উপাধি দেন। রাজা রামমোহন লন্ডনে যান। সেখানে তিনি কোম্পানির শাসনে ভারতীয়দের দুরবস্থার কথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জানান। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের সাথে না হয়ে কৃষকদের সাথে হওয়া উচিত। তিনি বিচার ব্যবস্থার সংস্কারও দাবি করেন।

রামমোহন রায়ের মৃত্যু : লন্ডন থেকে রাজা রামমোহন রায় ফরাসি বিপ্লবের স্মৃতিকাগার ফ্রান্স সফরে যান। ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। ১৮৩৩ সালে তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন। ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিস্টল শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলা ব্যাকরণ এবং সমাজ, ধর্ম, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা, ইংরেজি ও ফার্সিতে তিরিশটিরও বেশি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায় তাঁর সংস্কার কার্যাবলির জন্য বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

(গ) **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :** ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২০ সালে বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় বীরসিংহ ছিল হুগলি জেলার অন্তর্গত। পরে এটি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস সামান্য বেতনের কর্মচারি ছিলেন।

শিক্ষাজীবন : ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। দারিদ্র্যের সঙ্কে সন্ধ্যায় করে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজের নিম্নশ্রেণীতে তিনি ভর্তি হন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় খুবই দক্ষতা অর্জন করেন। ১৮৪০ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। এ সময় তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর।



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

কর্মজীবন : ১৮৪১ সালে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষা বেশ ভালোভাবে শিখে ফেলেন। এরপর কিছু দিন তিনি সংস্কৃত কলেজে সহকারি সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি পুনরায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৮৫১ সালে তিনি এ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৮৫৫ সালে তাঁকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক করা হয়। এ সময় তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে ৩০০ এবং অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য ২০০ টাকা মাসিক বেতন পেতেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ইয়ং-এর সাথে মতের মিল না হওয়ায় তিনি পাঁচশত টাকা বেতনের চাকরি হেলায় ছেড়ে দেন। সে আমলে ৫০০ টাকার দাম ছিল অনেক। এ ঘটনা থেকে আমরা বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতার পরিচয় পাই।

সাহিত্যকর্ম : সংস্কৃত কলেজের সহকারি সম্পাদক থাকাকালীন সময়েই ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি পরিপূর্ণভাবে সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রায় ২৫ খানা বাংলা বই লেখেন। তাঁকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়।

সমাজ সংস্কার : বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য চেষ্টা করেন। বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তা প্রমাণ করার জন্য তিনি লিখিতভাবে তাঁর মতামত প্রচার করতে থাকেন। গৌড়া হিন্দুগণ তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। এমন কি তাঁকে মেরে ফেলারও ষড়যন্ত্র করা হয়। অবশেষে তাঁর চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহের আইন পাস হয়। বিদ্যাসাগর তাঁর একমাত্র ছেলে নারায়ণচন্দ্রের বিয়ে দেন একজন বিধবা মেয়ের সাথে।

বিদ্যালয়প্রাণ : ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষার প্রসারের জন্য যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। তিনি নিজ গ্রাম বীরসিংহে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক থাকাকালীন তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি কলকাতা মেট্রোপলিটান কলেজেরও প্রতিষ্ঠাতা। এ সকল কাজের জন্য ১৮৮০ সালে বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন।

দানশীলতা : বিদ্যাসাগর খুব দানশীল ছিলেন। তিনি বই লিখে প্রচুর টাকা আয় করেন। এ টাকা তিনি অকাতরে দান করতেন। ১৮৬৬-৬৭ সালে বাংলাদেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়। বাংলা ১২৭২ সনে এ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে একে বাহাওরের মন্বন্তর বলা হয়। এ সময় প্রায় ছয় মাস ধরে তিনি নিজ গ্রামে লোকজনের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেন। সে আমলের প্রায় দুই হাজার টাকার কাপড়ও তিনি দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যু : ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। তাঁর কীর্তির জন্য মরেও তিনি অমর হয়ে রয়েছেন।

(খ) **নওয়াব আবদুল লতিফ :** আবদুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হন।

কর্মজীবন : কর্মজীবনের শুরুতে আবদুল লতিফ কিছু দিন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি ইংরেজি ও আরবির অধ্যাপক হিসেবে কলকাতা মাদ্রাসায় যোগদান করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৬২ সালে আবদুল লতিফ বাংলার আইন পরিষদের সদস্য হন। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ সম্মান লাভ করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। ১৮৮৪ সালে তিনি অবসর নেন। সরকারের নিকট থেকে তিনি প্রথমে ‘খান বাহাদুর’ এবং পরে ‘নওয়াব’ উপাধি পান।



নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

আবদুল লতিফের অবদান : নওয়াব আবদুল লতিফ সব সময় মুসলমানদের উন্নতির জন্য ভাবতেন। এ সময় মুসলমানগণ শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে হিন্দুদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। তিনি মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা

গ্রহণ করতে বলেন। ১৮৬৩ সালে তিনি ‘মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। তিনি ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতা করার জন্য মুসলমানদের পরামর্শ দেন।

বাংলার মুসলমানদের জাগরণের জন্য তিনি বিরাট অবদান রাখেন। উত্তর ভারতে মুসলমানদের উন্নতির জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে ভূমিকা পালন করেন, বাংলার মুসলমানদের উন্নতির জন্য সে কাজ করেন নওয়াব আবদুল লতিফ।

(ঙ) সৈয়দ আমীর আলী : বাংলার মুসলমান সমাজকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর এক জন চিন্তানায়ক কাজ করেন। তিনি সৈয়দ আমীর আলী। ১৮৪৯ সালে হুগলির এক সম্ভ্রান্ত শিয়া পরিবারে তাঁর জন্ম হয়।

শিক্ষা জীবন : সৈয়দ আমীর আলী পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। ১৮৬৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পাস করেন। পরের বছর তিনি বি, এল, ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি ব্যারিস্টার হন।

কর্মজীবন : সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলার আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি ভাইস রয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৮৯০ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে আসীন ছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি লন্ডনে প্রিভিকাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম প্রিভিকাউন্সিলের ছিলেন।

সমাজ সেবা : সৈয়দ আমীর আলী মুসলমান সমাজে আধুনিকীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি সুপণ্ডিত ও শক্তিশালী লেখক ছিলেন। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদের অতীত গৌরব ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর ‘দি স্পিরিট অব ইসলাম’ এবং ‘এ শর্ট হিস্ট্রি অব দি সারাসিনস’ অত্যন্ত উন্নত মানের বই। তিনি মুসলমানদেরকে সক্রিয় রাজনীতি করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৮৭৭ সালে তিনি কলকাতায় ‘সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ভারতের অন্যান্য শহরে এর অনেক শাখা অফিস ছিল। মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া পেশ করা ছিল এ সংগঠনের উদ্দেশ্য। এ সংগঠনই ভারতীয় মুসলমানদের সক্রিয় রাজনীতিতে আসার পথ দেখায়। সৈয়দ আমীর আলীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তবে তিনি মনে করতেন যে, রাজনীতিতে ভারতীয় মুসলমানদের পথ হিন্দুদের থেকে আলাদা। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিনি লন্ডন থেকে একে স্বাগত জানান। ১৯১২ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

উপাধি লাভ ও মৃত্যুবরণ : ১৮৮৭ সালে সৈয়দ আমীর আলী সরকারের নিকট থেকে সি, আই, ই, উপাধি পান। ১৯২৮ সালে লন্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। বাঙালি মুসলমানদের জন্য স্যার সৈয়দ আমীর আলীর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।



সৈয়দ আমীর আলী (১৮৬৭-১৯২৮)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফকির আন্দোলনের মূল কেন্দ্র কোন অঞ্চল ?
 ক. উত্তরবঙ্গ খ. সীমান্তবর্তী অঞ্চল
 গ. দক্ষিণ বঙ্গ ঘ. উপকূলীয় অঞ্চল।
২. ফকিররা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণ—
 i এ সরকার তাদের অবাধ চলাচলে বাধা দান করে বলে
 ii তাদের মুঠি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণার ফলে
 iii তাদের অস্ত্র বহন করাকে অপরাধ গণ্য করার ফলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদ পড় এবং ৩ - ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এদেশের সমাজ ও মানুষের মধ্যে ক্রমেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসেন তিতুমীর, দুদুমিয়া, হাজী শরিয়তউল্লাহ, ফকির মজনু শাহসহ আরও অনেকে।

৩. হাজী শরিয়তউল্লাহর নামের সঙ্গে কোন আন্দোলন জড়িত ?
 ক. ফকির আন্দোলন খ. ফরায়েজি আন্দোলন
 গ. নীল বিদ্রোহ ঘ. তিতুমীরের সংগ্রাম
৪. অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হন। কারণ— তাঁরা
 i. অবাধ ধর্মীয় কার্যকলাপে বাধা পান
 ii. নিষ্কর ভূমি দান থেকে বিতাড়িত হন
 iii. শিক্ষাদীক্ষায় বাধাগ্রস্ত হন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে ফকির আন্দোলনের ব্যাপ্তিকাল—

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. ১৭৬০ - ১৮০০ | খ. ১৮০০ - ১৮৩১ |
| গ. ১৮৪০ - ১৮৪৯ | ঘ. ১৮৫৯ - ১৮৬০ |

৬. মোহাম্মেদান লিটারেরি সোসাইটি কে গড়ে তোলেন ?

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ক. আবদুল লতিফ | খ. সৈয়দ আমীর আলী |
| গ. হাজী মুহম্মদ মুহসীন | ঘ. রামমোহন রায় |

৭. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহাম্মেদান এসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল মূলত—

- | | |
|--|---|
| ক. মুসলমানদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা | খ. মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া পেশ করা |
| গ. মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করা | ঘ. মুসলিম সমাজকে আধুনিকীকরণ করা |

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৮-৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সালমান প্রাচীন ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস পড়ার সময় খেয়াল করল সে সময় মুসলমানরা সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়ছিল। তবে সৈয়দ আমীর আলীর মতো কিছু মনীষীর সহায়তায় তাদের সে অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটতে থাকে এবং সফলতাও লাভ করতে থাকেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলন

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের দ্বারা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনা করে। ধীরে ধীরে ইংরেজদের সাম্রাজ্য প্রায় গোটা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বড় ধরনের সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এর ফলে এ দেশে কোম্পানির শাসনের অবসান হয়। এ দেশ সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের শাসনে চলে যায়। এরপর শুরু হয় রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন। এ সকল আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ স্বাধীন হয়। এ অধ্যায়ে আমরা ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংক্ষেপে আলোচনা করব। তোমরা বড় হয়ে এ সকল ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

(ক) ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম : নানাবিধ কারণে ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম শুরু হয়। এ কারণগুলোকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামরিক কারণ হিসেবে ভাগ করা যায়।

রাজনৈতিক কারণ : পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজদের ছলে বলে কৌশলে রাজ্য বিস্তার নীতি দেশীয় রাজাদের শক্তিক্ত করে তোলে। তাঁরা দিল্লীর সম্রাটকে নিজেদের সম্রাট বলে ভাবতেন। জনসাধারণও তাঁকেই তাদের নেতা মনে করত। ডালহৌসি ঘোষণা করলেন যে, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর দরবার বিলুপ্ত হবে। এ ঘোষণা জনসাধারণ, বিশেষ করে মুসলমানদের মনে আঘাত হানে। তাই তারা ব্রিটিশদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

সামাজিক কারণ : বেকিৎকের বিভিন্ন সমাজ সংস্কার গৌড়া হিন্দুদের অসন্তুষ্ট করে। বিশেষ করে সতীদাহ প্রথা নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলনকে তখনও হিন্দুগণ মেনে নিতে পারেনি। ফার্সি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি অফিস আদালতের ভাষা করায় মুসলমানগণও অসন্তুষ্ট হয়। সুতরাং হিন্দু মুসলমান দু’শ্রেণীই ব্রিটিশ শাসনের অবসান কামনা করত।

অর্থনৈতিক কারণ : ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করে ফলে আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটির শিল্প ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদের দেশের প্রচুর সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করা হয়। চাকরির ক্ষেত্রেও দেশীয়দের বঞ্চিত করা হত। যোগ্যতা থাকলেও দেশীয়দের উপযুক্ত চাকরি দেওয়া হত না। ফলে দেশবাসী দিন দিন গরিব হয়ে পড়ে।

ধর্মীয় কারণ : পাদ্রীগণ এদেশের জনগণকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। শাসকশ্রেণী এ ব্যাপারে তাদের সহায়তা করত। তারা এদেশের যুবসম্প্রদায়কে খ্রিস্টান করার জন্য নানা রকম লোভ দেখাত। বক্তৃতা করে কিংবা পত্র-পত্রিকায় লিখে তারা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মের কুৎসা রটনা করত। এসকল কাজকর্ম দেশবাসীকে ক্ষুব্ধ করে।

সামরিক কারণ : কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে দেশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। যোগ্যতা থাকলেও দেশীয়দেরকে উচ্চপদ দেওয়া হত না। দেশীয় সিপাহীদের বেতন ও ভাতা ইউরোপীয় সিপাহীদের চেয়ে অনেক কম ছিল। দেশীয় সিপাহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচরণ করা হত। সমুদ্র পাড়ি দিলে জাত যাবে এরকম একটা ধারণা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের ছিল। যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সৈন্যদেরকে বার্মায় (বর্তমানে মায়ানমার) পাঠানো হয়। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়। ১৮৫৭ সালে ‘এনফিল্ড’ নামে নতুন রাইফেল চালু করা হয়। এ রাইফেলের টোটাং চর্বি মাখানো ছিল। এই টোটাং দাঁতে কেটে রাইফেল দুকাতে হত। গুজব রটল যে, টোটাং মাখানো চর্বি গরু ও শূকরের। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীর সৈনিকগণ মনে করল, তাদের জাতি তথা ধর্ম নাশ করার জন্যই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সুতরাং অসন্তোষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

বিদ্রোহ ও সঙ্গ্রাম : ১৮৫৭ সালের ২৬শে জানুয়ারি ব্যারাকপুরের সিপাহিরা প্রথম বিদ্রোহ করে। ক্রমে তা বহরমপুর ও মীরাটে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর সিপাহীগণ দিল্লী অধিকার করে বৃন্দ বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। অযোধ্যা ও রোহিলাখন্ডের শাসকগণ সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জানায়। মীরাট, লক্ষ্মৌ, কানপুর, বেরিলি, ঝাঁসি ইত্যাদি ব্রিটিশ বিরোধী সঙ্গ্রামের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সঙ্গ্রামের ব্যর্থতা : শেষ পর্যন্ত এ সঙ্গ্রাম ব্যর্থ হয়। চার মাস অবরোধ করে রাখার পর ব্রিটিশগণ দিল্লী দখল করে নেয়। ধৃত সৈনিক ও সাধারণ মানুষের ওপর তারা নির্মম অত্যাচার করে। বাহাদুর শাহকে রেঞ্জুনে নির্বাসন দেয়। বেশ কয়েক জন শাহজাদাকে হত্যা করে।

ইংরেজগণ লক্ষ্মৌ দখল করে নেয়। অন্যতম নেতা মৌলভি আহমেদ উল্লাহ যুদ্ধে নিহত হন।

কানপুরে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন পেশোয়া-র দত্তকপুত্র নানা সাহেব। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি পলায়ন করেন। ইংরেজগণ কানপুর দখল করে নেয়। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই যুদ্ধে আহত হন। পরে তিনি মারা যান। ঝাঁসি ইংরেজদের দখলে আসে। প্রায় এক বছর স্বাধীন থাকার পর ইংরেজদের হাতে রোহিলাখন্ডেরও পতন হয়। ১৮৫৭ সালের ৭ই জুলাই ইংরেজগণ উপমহাদেশে শান্তি ঘোষণা করে।

যুদ্ধে ব্যর্থতার কারণ : এ সঙ্গ্রাম কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা মোতাবেক পরিচালিত হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে তা পরিচালিত হয়। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্রও তেমন ছিল না। অপরদিকে ইংরেজদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিল অনেক উন্নত। তাদের যুদ্ধ পরিচালনাও ছিল সুপরিকল্পিত। পাঞ্জাব, নেপাল, হায়দরাবাদ ইত্যাদি অনেক দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ ইংরেজদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে। এ সকল কারণে সঙ্গ্রাম ব্যর্থ হয়।

সঙ্গ্রামের ফলাফল : সঙ্গ্রামের ব্যর্থতার পর ইংরেজগণ মুসলমানদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বাহাদুর শাহকে রেঞ্জুনে নির্বাসন দেয়। তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। দিল্লী দখলের পর বেশ কিছু দিন এদেশীয় মানুষ দেখলেই তারা তাকে হত্যা করত।

সঙ্গ্রাম ব্যর্থ হলেও এটি একেবারে বিফলে যায়নি। ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে, এত বড় একটা দেশের শাসনভার একটি কোম্পানির হাতে রাখা ঠিক নয়। তাই ব্রিটিশ সরকার উপমহাদেশের শাসনভার সরাসরি নিজের হাতে তুলে নেয়। এ জন্য ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক আইন পাশ করে। ভারতের শাসনকর্তাকে তখন থেকে বলা হয় ভাইসরয়। ১৮৫৭ সালের ১লা নভেম্বর রানি ভিক্টোরিয়া ঘোষণা দেন যে, ব্রিটিশগণ উপমহাদেশে আর রাজ্য বিস্তার করবে না। দেশীয় রাজাদের সাথে যে সকল চুক্তি করা হয়েছে তা মেনে চলা হবে। যোগ্যতা অনুসারে সবাই সরকারি চাকরি পাবে। কোনো ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে না।

(খ) আলীগড় আন্দোলন : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সঙ্গ্রামের জন্য ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের দায়ী করে। তারা ইংরেজদের অত্যাচারের শিকার হয়। অন্যদিকে মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করায় তারা সকল বিষয়ে হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে। এ পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের বাঁচার পথ দেখান স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ : স্যার সৈয়দ আহমদ খান ১৮৭৭ সালে উত্তর প্রদেশের আলীগড়ে মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। পরে এ কলেজই আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানগণকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার উপদেশ দেন। তিনি তাদের পরামর্শ দেন ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করতে। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানগণ আলীগড়ে পড়াশুনা করতে আসেন।

আলীগড় আন্দোলন : পড়াশুনা শেষে মুসলমানগণ সরকারি চাকরিসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হন। তাঁরা চিন্তা-চেতনায় স্বতন্ত্র ধারার অধিকারী ছিলেন। মুসলমান কৃষি ও সভ্যতার ধারক হিসেবে তাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠা পান। পরবর্তীকালে তাঁরাই ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন। আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারার সৃষ্টি হয়, উপমহাদেশের ইতিহাসে তাই আলীগড় আন্দোলন নামে পরিচিত।

আলীগড় আন্দোলনের প্রভাব : আলীগড় আন্দোলনের নেতগণ পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানগণ যে একটি স্বতন্ত্র জাতি এ বোধ আলীগড় আন্দোলন থেকেই জন্ম নেয়। আলীগড় আন্দোলনের

ফলেই মুসলমানগণ আলাদা আবাসভূমির দাবি করে। আর এর ফলেই ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ হয় এবং পাকিস্তানের জন্ম হয়।

(গ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস: ১৮৮৫ সালে ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস’ বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। এলান অষ্টোভিয়ান হিউম নামে একজন অবসর প্রাপ্ত আই.সি.এস. অফিসার এটি গঠনের উদ্যোগ নেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগেও উপমহাদেশে একাধিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। তবে সেগুলোর কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য: কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা। ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ইংরেজ সরকারের কাছে পেশ করাও এর উদ্দেশ্য ছিল।

কংগ্রেসের ভূমিকা: কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) শহরে। কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এ অধিবেশনে মাত্র ৭২ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। ধীরে ধীরে কংগ্রেস শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের লক্ষ্য। এ সময় থেকে কংগ্রেসের ভেতরে চরম পন্থী ও উদার পন্থীদের দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। চরম পন্থীদের নেতা ছিলেন বালগঞ্জাধর তিলক, লাল লাজপৎ রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল। আর উদার দলের নেতা ছিলেন ফিরোজ শাহ মেহতা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ। ১৯০৭ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে এ বিরোধ চরমে ওঠে। চরম পন্থীগণ কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯১৫ সালে বিরোধের মীমাংসা হয়। কিন্তু ১৯১৯ সালে মর্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার গ্রহণের প্রশ্নে আবার দুপক্ষে বিরোধ দেখা দেয়। উদার পন্থীগণ শাসন-সংস্কার গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। চরম পন্থীগণ তাঁদের সাথে একমত না হওয়ায় উদার পন্থীগণ কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

ইতোমধ্যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, খান আবদুল গফফার খান, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত গান্ধী ছিলেন কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা। এ সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ‘সত্যগ্রহ’ ‘অসহযোগ’ ‘আইন অমান্য’ ও ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন হয়। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভে কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

(ঘ) বঙ্গভঙ্গা: ইংরেজ শাসনামলে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে বৃহৎ বঙ্গ প্রদেশ গঠিত ছিল। এ বিশাল প্রদেশের রাজধানী ছিল কলকাতা। কলকাতা একই সাথে আবার ব্রিটিশ ভারতেরও রাজধানী ছিল। একজন লে: গভর্নর কলকাতা থেকে বিশাল বঙ্গ প্রদেশ শাসন করতেন।

১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় হয়ে আসেন। তিনি অনুভব করলেন যে, শাসনের সুবিধার জন্য প্রদেশটি ভাগ করা দরকার। তাই ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি নিয়ে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তিনি বঙ্গ প্রদেশকে দুভাগে ভাগ করেন। পূর্ব ভাগে পড়ে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ। এর সাথে আসামকে যুক্ত করে তিনি একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। নতুন প্রদেশের নাম হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম। এর রাজধানী হয় ঢাকা। অপরদিকে প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে গঠিত প্রদেশের নাম হয় বঙ্গদেশ। এর রাজধানী কলকাতাতেই রাখা হয়। আগের বঙ্গ প্রদেশকে এ দু প্রদেশে বিভক্তকরণই বঙ্গভঙ্গা নামে পরিচিত।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া: বঙ্গভঙ্গা বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান উচ্চ ও মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কে গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। বর্ধমানের মৌলভি আবুল কাসেম এবং কুমিল্লার ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের মতো কতিপয় মুসলিম নেতা ছাড়া বাংলার অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান এ বিভক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল। এদের প্রধান নেতা ছিলেন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। মুসলমানদের অধিকাংশই বঙ্গভঙ্গাকে সমর্থন করেছিল এ কারণে যে, তারা মনে করেছিল এ পদক্ষেপের ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের সুবিধা ও উন্নতির পথ সুগম হবে। অন্যদিকে শিক্ষিত হিন্দুদের অনেকেই আশঙ্কা করেছিল যে, বঙ্গভঙ্গার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং বাঙালি জাতি দ্বিখণ্ডিত হবে। তারা বঙ্গভঙ্গাকে চিহ্নিত করে বাঙালি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র হিসেবে। এজন্য বঙ্গভঙ্গার বিরুদ্ধে তারা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলন বঙ্গভঙ্গা আন্দোলন নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের একটি বিশেষ দিক ছিল বিদেশি পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যের ব্যাপক প্রচলন। এ জন্য এ আন্দোলনকে স্বদেশী আন্দোলনও বলা হয়। সে সময় এক অভূতপূর্ব স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল। সে সময়কালের রচিত বেশ কয়েকটি দেশাত্মবোধক

গান আজও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালির নিকট জনপ্রিয়। ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করলে আন্দোলনটি সন্ত্রাসবাদের পথে চলে যায়। এভাবে জন্ম হয় বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে সূচনা হয় সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী আন্দোলনের। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ওপরও এ আন্দোলনের প্রভাব দেখা যায়।

বঙ্গভঙ্গ রদ : অবশেষে কংগ্রেস ও শিক্ষিত হিন্দুদের প্রবল চাপের মুখে ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করে। ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারি দুই বাংলাকে আবার যুক্ত করা হয়। তবে বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আর ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নেওয়া হয়।

ব্রিটিশ শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই প্রথম বৃহৎ জাতীয় আন্দোলন। ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আন্দোলনের চাপে তারা সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। এ ঘটনা থেকে মুসলমানগণ এ শিক্ষা পেল যে, দাবি আদায় করতে হলে তাদেরও আন্দোলনের প্রয়োজন।

(ঙ) **মুসলিম লীগ :** বঙ্গভঙ্গের ফলে গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের শাহবাগে ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর গঠিত হয় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ গঠনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আগা খান, নওয়াব ভিকার-উল-মুলক ও ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।

মুসলিম লীগ গঠনের উদ্দেশ্য : মুসলিম লীগ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাদের দাবি-দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করা। সরকারের প্রতি অনুগত থাকা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখাও মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল।

বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম লীগ : মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে মুসলিম লীগ ক্ষুব্ধ হয়। ১৯১২ সালে মুসলিম লীগের সম্মেলন খুব বড় করে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ যোগ দেন। তিনি তখনও কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তিনি এ সম্মেলনে বলেন, বৃহত্তর স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রয়োজন। ১৯১৩ সালে জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগ দেন। তিনি কংগ্রেসেরও সদস্য থাকেন।

লক্ষ্মী চুক্তি : মুলত জিন্নাহর চেষ্টায় ১৯১৬ সালে লক্ষ্মী শহরে কংগ্রেস মুসলিম লীগের যুক্ত অধিবেশন বসে। এখানে উভয় সংগঠনের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এ চুক্তি লক্ষ্মী চুক্তি নামে খ্যাত। এ চুক্তিতে উভয় দল ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। কংগ্রেস আইন পরিষদ গুলোতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি মেনে নেয়। কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য পদের দাবিও স্বীকার করা হয়।

মুসলিম লীগের অবদান : ১৯৩৬ সাল থেকে জিন্নাহ মুসলিম লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হন। মুসলিম লীগ এ সময় থেকে মুসলমানদের দাবি আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ দল মুসলমানদের প্রায় একমাত্র দলে পরিণত হয়। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি করা হয়। এ দাবির ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

(চ) খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

খিলাফত আন্দোলন : রসুলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর যারা তাঁর প্রতিনিধি হন তাঁদের বলা হয় খলিফা। খলিফাগণ যে পদ অলংকৃত করতেন তার নাম খিলাফত। ১৫১২ সাল থেকে তুরস্কের সুলতানের ওপর খিলাফত বর্তায়। তখন থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত যিনি তুরস্কের সুলতান হতেন তিনি মুসলিম খলিফা হিসেবেও সম্মান পেতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটিশ বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়। এতে ভারতের মুসলমানগণ পড়ে মহাফাঁপড়ে। এক দিকে তারা ছিল ব্রিটিশ সরকারের অনুগত প্রজা। অপরদিকে তুরস্কের সুলতান ছিলেন তাদের খলিফা। ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের আশ্বাস দেয় যে, তুরস্কের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। সরল বিশ্বাসে মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জোগায়।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ : কিন্তু যুদ্ধ শেষে বিজয়ী ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। তারা তুরস্কের ওপর অন্যান্য সন্ধি চাপিয়ে দেয়। তুরস্কের অনেক এলাকা মিত্র পক্ষ কেড়ে নেয়। এতে মুসলমানগণ খুবই মর্মান্বিত হয়।

খিলাফত কমিটি গঠন : মুসলমানগণ এ অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেন। ১৯১৯ সালের ১১ই নভেম্বর মুসলিম নেতৃবৃন্দ বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) শহরে খিলাফত কমিটি গঠন করেন। খিলাফতের সম্মান রক্ষার জন্য এ খিলাফত কমিটির নেতৃত্বে যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তাই খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত। মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, ড. আনসারী, আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান প্রমুখ খিলাফত আন্দোলনের নেতা ছিলেন। গান্ধী, তিলক, মতিলাল নেহেরু, মদন মোহন মালব্য প্রমুখ কংগ্রেস নেতাও এ আন্দোলনকে সমর্থন করেন।

অসহযোগ আন্দোলন : ইতোমধ্যে রাউলট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯২০ সালের ১০ই মার্চ গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ঐ বছর ২০শে মে তারিখে কেন্দ্রীয় খিলাফত কনফারেন্সেও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর অর্থ হল ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবে। অফিস আদালতে কাজ করবে না। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া উপাধি বর্জন করবে ইত্যাদি।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন : ১৯২০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাছাড়া স্থির হয় যে, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একসাথে পরিচালিত হবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রায় এক বছর দুটি আন্দোলন যুগপৎ পরিচালিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন স্থগিতকরণ : ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের চৌরীচৌরা নামক একটি গ্রামে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। জনতা থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। ২২ জন পুলিশ পুড়ে মারা যায়। আন্দোলন অহিংস থাকছে না মনে করে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন।

খিলাফত আন্দোলনের সমাপ্তি : অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পর খিলাফত আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়ল। এ সময় মোস্তফা কামাল তুরস্কের ক্ষমতায় আসেন। তিনি তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। সুতরাং খিলাফত আর রইল না। এর ফলে ভারতেও খিলাফত আন্দোলনের অবসান হয়।

(ছ) লাহোর প্রস্তাব : ১৯৪০ সালে ২৩শে মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ প্রস্তাবের আগেই মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, হিন্দু ও মুসলমানগণ দুটি আলাদা জাতি। তাঁর এ ঘোষণা ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’ হিসেবে পরিচিত।

লাহোর অধিবেশনে জিন্নাহ সভাপতিত্ব করেন। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। অন্য কোনো ব্যবস্থা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁর এ প্রস্তাব মুসলিম নেতাগণ সমর্থন করেন। এ প্রস্তাব লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত।

লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের কোনো উল্লেখ ছিল না। তবুও এ প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব নামেও পরিচিত। পরবর্তীকালে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করা হয়। একাধিক রাষ্ট্রের স্থলে একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়।

(জ) পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম : লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করার পর উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলি খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫ সাল) চলছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সমর্থন পেতে চায়। কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দাবি ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯৪২ সালে গান্ধী ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন শুরু করেন।

যুদ্ধের শেষে ইংল্যান্ডে নির্বাচন হয়। নির্বাচনে শ্রমিকদল জয়ী হয়। শ্রমিকদল ছিল ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী। এ সময় ভারতেও নির্বাচন হয়। মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির ওপর নির্বাচন করে। এ দল প্রায় সকল মুসলমান আসনে জয়ী হয়।

ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালে মন্ত্রিসভার তিন জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল ভারতে পাঠায়। এটি ‘মন্ত্রি মিশন’ নামে পরিচিত। প্রতিনিধিদল ভারতকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করার প্রস্তাব করে। মাদ্রাজ, বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই), মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এ ছয়টি হিন্দু প্রধান প্রদেশ ‘ক’ গ্রুপে রাখার প্রস্তাব করা হয়। ‘খ’ গ্রুপে রাখার প্রস্তাব করা হয় মুসলিম প্রধান পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে। আর বাংলা

ও আসামকে ‘গ’ গ্রুপে রাখার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এ প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে। ফলে ভারত ভাগ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দিতে চায়। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে শেষ গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় করে পাঠানো হয়। তিনি ভারতীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করে ওরা জুন ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এ পরিকল্পনা ওরা জুন পরিকল্পনা নামে খ্যাত। উপমহাদেশকে ‘ভারত ইউনিয়ন’ ও ‘পাকিস্তান’ এ দুটি রাষ্ট্রে ভাগ করার কথা বলা হয়। পাঞ্জাব এবং বাংলাকেও ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়। বলা হয় যে, দেশীয় রাজ্যগুলো ভারত ও পাকিস্তান যে কোনো একটির সাথে যোগ দিতে পারবে।

অবশেষে ১৯৪৭ সালে ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ‘ভারত স্বাধীনতা আইন’ পাস হয়। এ আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের হাতে এবং ১৫ই আগস্ট ভারতীয় গণপরিষদের হাতে মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। উপমহাদেশ স্বাধীন হল। জন্ম নিল ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের সামাজিক কারণ ?

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ক. দিল্লীর দরবার বিলুপ্ত করা | খ. ইংরেজদের রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করা |
| গ. ভারতের সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করা | ঘ. ফার্সি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি সরকারি ভাষা করা। |

২. নিচের কোন বৈশিষ্ট্য ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?

- প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
- সংসদীয় সরকার
- আইনসভার সীমাবদ্ধতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি ১৯২০ সালে ‘মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার আইন’ এবং ‘রাউলট আইন’-এর প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

৩. অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য কোন কারণটি দায়ী ?

- ২২ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারা
- অর্থনৈতিক সংকট
- ইংরেজদের ভয়ে ভীত হয়ে

৪. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কী ছিল ?

- ক. মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার
- খ. হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সাধন
- গ. বঙ্গভঙ্গা রোধ করা
- ঘ. খিলাফত রক্ষা ও ভারতের স্বাধীনতা অর্জন

৫. মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন—

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. ১৯২০ – ১৯৪৭ | খ. ১৯২০ – ১৯৪৫ |
| গ. ১৯২০ – ১৯৪০ | ঘ. ১৯২০ – ১৯৩৫ |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শিহাব ও সজল ইতিহাসের ছাত্র। তাদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গা নিয়ে কথা হচ্ছিল। শিহাব বলল “প্রাথমিকভাবে প্রশাসনিক সুবিধার কারণে বঙ্গভঙ্গা করা হলেও এর পিছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণও ছিল।” সজল বলল “এই বঙ্গভঙ্গার ফলে এদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একধরনের দ্বিধা ও বিভক্তির সৃষ্টি করে। অবশেষে হিন্দুদের চরম বিরোধিতার মুখে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গা রদের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।”

- ক. বঙ্গভঙ্গা কী ?
- খ. বঙ্গভঙ্গার অর্থনৈতিক কারণ বর্ণনা কর।
- গ. তৎকালীন সমাজে বঙ্গভঙ্গার ফলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল— ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “বঙ্গভঙ্গা রদের পিছনে ছিল হিন্দুদের দুরভিসন্ধি”—উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২. আমাদের এ উপমহাদেশে স্যার সৈয়দ আহমদ খান একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি আলীগড় আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি মুসলমান সমাজে এক ধরনের জাগরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ অবদানের জন্য মুসলমান সমাজে তার নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

- ক. আলীগড় আন্দোলন কী ?
- খ. আলীগড় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
- গ. তৎকালীন মুসলিম সমাজে আলীগড় আন্দোলনের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ভারতের মুসলমানদের পুনর্জাগরণে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অবদান মূল্যায়ন কর।

সন্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়। এর ছিল দুটি অংশ-পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। দুটি অংশের মাঝখানে ছিল বিশাল দেশ ভারত। এক অংশ থেকে অপর অংশের দূরত্ব ১২০০ মাইল। দু অংশের ভাষা ও সংস্কৃতিতে মিল ছিল না। নানা কারণেই দু অংশের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

(ক) ভাষা আন্দোলন : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম বিরোধ দেখা দেয় ভাষার প্রশ্নে। পূর্ব বাংলার লোকসংখ্যা বেশি। তাদের মাতৃভাষা বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। উর্দু ছিল অতি অল্প সংখ্যক লোকের ভাষা। তবুও উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ হয়। উর্দুর সাথে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয়। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ২৪শে মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও তিনি এ একই উক্তি করেন। ছাত্ররা দুজায়গায়তেই জিন্নাহর কথার প্রতিবাদ করে।

জিন্নাহ ও লিয়াকত আলীর মৃত্যু : ভাষা সমস্যার কোনো সমাধান হওয়ার আগেই ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর মৃত্যু হয়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালে নিহত হন। তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দীন। তিনিও ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পরিবর্তে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেন।

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ : নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যে পূর্ব বাংলায় চরম অসহযোগ দেখা দেয়। ছাত্ররা ‘সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করে। সংগ্রাম পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দৃঢ় সংকল্প নেয়। তারা ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস ও সাধারণ হরতাল করার কর্মসূচি গ্রহণ করে।

ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ : নুরুল আমীন ছিলেন সে সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ঢাকায় তখন প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন চলছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পূর্বাংশে ছিল সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং। ছাত্ররা আর্টস বিল্ডিং চত্বরে আমতলায় জমায়েত হয়। তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আইনপরিষদে গিয়ে প্রতিবাদ লিপি পেশ করতে চায়। মেডিকেল কলেজের সামনে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর শহীদ হন। অনেক ছাত্র জনতা আহত হয়। দেশের সকল স্তরের মানুষ নিন্দা ও আক্রোশে ফেটে পড়ল। দেশের সকল স্থানে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও হরতাল পালিত হতে লাগল।

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব : এরপর প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে নির্মিত হয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। শেষ পর্যন্ত সরকার বাঙালিদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের আলাদা জাতি হিসেবে পরিচিতি দেয়। এ আন্দোলন তাদেরকে অধিকার আদায়ে সচেতন করে তোলে। ১৯৫৪-র নির্বাচনে জয়লাভ, ১৯৬২-র শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা দাবি উত্থাপন, ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-র নির্বাচনে জয়লাভ এবং ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধ এসব ঘটনার পেছনে বায়ান্নর চেতনা কাজ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। বাঙালির জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব তাই অপরিসীম।

(খ) ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট : ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের প্রতি বাংলার অধিকাংশ মানুষ তখন খুবই ক্ষুধ্ধ। নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। কৃষক প্রজা পার্টির এ. কে. ফজলুল হক এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব দেন। বিখ্যাত ২১ দফা ছিল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ওয়াদা। আর

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল ‘নৌকা’। নির্বাচনে মুসলিম লীগের চরম পরাজয় ঘটে। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পায়। যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়ী হয়। এ জয়ের পেছনে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও ছাত্রদের বিরাট ভূমিকা ছিল। যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে ‘ব্যাংকট বিপ্লব’ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

(গ) পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য : ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এক সাথে ছিল। এই ২৪ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করে। এ বৈষম্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রকটভাবে ধরা পড়ে।

রাজনৈতিক বৈষম্য : চক্রান্ত করে যুক্তফ্রন্টের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী বিজয়কে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানে বার বার কেন্দ্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাঙালিদের সংখ্যাসাম্য মেনে নিতে হয়। অথচ বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু তারপরও নানা অজুহাতে সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। এ সামরিক আইন ছিল বাঙালিদের রাজনৈতিক অধিকারকে দাবিয়ে রাখার অপকৌশল মাত্র।

অর্থনৈতিক বৈষম্য : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য ছিল আরও প্রকট। পূর্ব পাকিস্তানের পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি থেকে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার বেশিরভাগ অর্জিত হত। এ আয়ের সিংহভাগ খরচ হত পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। পূর্ব পাকিস্তান ছিল বঞ্চিত। বিদেশ থেকে যে ঋণ আসত তারও বেশির ভাগ খরচ হত পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ ঋণের বোঝা বাঙালিদেরও বহন করতে হত। এমনভাবে ব্যাংক, বীমা, চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিরা ছিল অবহেলিত ও বঞ্চিত। উন্নয়নের যে আশা সাধারণ মানুষ করত তার নাগাল তারা কোনো দিনই পায়নি।

সামরিক বৈষম্য : দেশরক্ষা বাহিনীর চাকরি পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রায় একচেটিয়া অধিকারে ছিল। মোট বাজেটের প্রায় ৬০% ব্যয় হত সামরিক খাতে। এর প্রায় পুরো অংশই ভোগ করত পশ্চিম পাকিস্তানিরা। সামরিক বিভাগে বাঙালি অফিসার ও জওয়ানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। বাঙালি অফিসারদের পদোন্নতি দেওয়া হত না। বাঙালিদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হত। স্থল, নৌ, বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর এবং সমরাস্ত্র কারখানাগুলো ছিল সবই পশ্চিম পাকিস্তানে।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য : পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালি সংস্কৃতিকে হিন্দু প্রভাবিত বলত। রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। বাংলা নাটক ও সিনেমার প্রতি করা হত অবজ্ঞা। এক কথায় বাংলা সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলা বৈষম্যের শিকার হয়।

(ঘ) ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন : বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য ও অবিচার দূর করার জন্য আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবি পেশ করে। ১৯৬৬ সালের ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এই ছয় দফা পেশ করেন। এই ছয় দফা দাবি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। দফাগুলোর সর্ধক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

- ১। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে একটি সত্যিকার ফেডারেশন গঠন করতে হবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত আইনসভা হবে সার্বভৌম।
- ২। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে শুধু দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ।
- ৩। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দুটি মুদ্রা প্রচলন করতে হবে।
- ৪। সকল প্রকার ট্যাক্স বা খাজনা ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকার যা আদায় করবে তার একটা অংশ ফেডারেল সরকারের খাতে জমা করবে।
- ৫। দু অঞ্চল যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে তার আলাদা হিসেব রাখতে হবে। বিদেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি ও আমদানি রপ্তানির অধিকার থাকবে আঞ্চলিক সরকার দুটির হাতে।
- ৬। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করতে হবে।

কিন্তু পাকিস্তান সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাগণ ছয় দফা প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। ফলে পাকিস্তানের দু অংশের মধ্যে বৈষম্য দূর করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ছয় দফা প্রকাশিত হলে সরকার বাঙালিদের ওপর দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে। ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র’ নামে এক মামলা দায়ের করা হয়। শেখ মুজিবকে করা হয় এ মামলার প্রধান আসামী। দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র

সমাজ ঐক্যবান্ধ হয়। তারা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ১১ দফার ভিত্তিতে তারা আন্দোলন শুরু করে। তাদের ১১ দফায় স্বাধিকারের দাবির সঙ্গে আরও কিছু দফা যুক্ত হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্যাংক-বীমা কোম্পানিসহ বড় বড় কলকারখানা জাতীয়করণ, স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ ইত্যাদি।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচন : ১৯৬৯ সালে আন্দোলন ক্রমশ উত্তাল হয়ে ওঠে। মওলানা ভাসানী আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তোলেন। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানেও এক ইউনিট বাতিল, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ইত্যাদি দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। তবে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার আন্দোলন এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে সরকার তা দমন করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে সরকার বাধ্য হয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি কারামুক্তির পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসভায় জনতার পক্ষ থেকে বাঙালিদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান ক্ষমতা ত্যাগ করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। তিনি প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন দেন। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে।

৭ই মার্চের ঘোষণা : আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে তা বাতিল করা হয়। এ ঘোষণার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ২রা মার্চ ঢাকা নগরী ও ৩রা মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে সারাদেশে সংগ্রামী জনতার সাথে পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষ ঘটে। এতে কয়েক শত মানুষ হতাহত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি বলেন, “----- ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। ----- এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” তিনি দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। বস্তুত এ ভাষণের মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য সর্বাঙ্গিক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

অবশেষে ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনার এক পর্যায়ে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ডেকে আনা হয়। কিন্তু ২৫শে মার্চ তারিখে হঠাৎ করে আলোচনা বন্ধ করে কোনো ঘোষণা না দিয়েই ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ঐ রাতে ঘুমন্ত জনগণের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য লোক হতাহত হয়। সে রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।



১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ লাখ জনতার উদ্দেশ্যে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন

স্বাধীনতার ঘোষণা : ২৫শে মার্চ গভীররাতে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। তিনি ঢাকায় দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং ওয়ার্লেস যোগে চট্টগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দেন। চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র থেকে ২৬শে মার্চ ঘোষণাটি আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান বঙ্গবন্ধুর নামে প্রচার করেন। ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের কয়েক জন বেতারকর্মী ও শিল্পী কালুরঘাটে অস্থায়ী বেতারকেন্দ্র স্থাপন করেন। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যাবেলায় উক্ত বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। ইতোমধ্যে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী গণপ্রতিনিধিরা ১৯৭১ সালে ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করেন। বাংলাদেশকে সার্বভৌম ও গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল এ সরকার শপথ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে। মন্ত্রিপরিষদের অন্য সদস্যরা ছিলেন এ এইচ এম কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন (অব:) মনসুর আলী এবং খন্দকার মুশতাক আহমদ। নতুন সরকার গঠিত হলে দেশের মানুষ দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। বাঙালি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, নারী, পুলিশ, আনসার, ইপিআর, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সরকারি কর্মচারী, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী। দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলে মুক্তিযুদ্ধ। এ নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। তারা শহর, বন্দর ও গ্রামের হাজার হাজার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। হত্যা করে লাখে লাখে নিরীহ বাঙালিকে। জীবনের নিরাপত্তার জন্য প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আমাদের এ মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার ও জনগণ সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে। সারা পৃথিবীর মানুষ পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বর আক্রমণ ও গণহত্যার তীব্র নিন্দা করে।

মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে। দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী মুক্তিকামী জনগণ তাদের জানমালের ঝুঁকি নিয়েও নানাভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করে। মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হন, দুই লক্ষ মা বোন নির্যাতিত হন। অসংখ্য রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, বন্দর, কলকারখানা, সরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ধ্বংস হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জামায়াতে ইসলামি, মুসলিম লীগ দলীয় এদেশীয় একটি গোষ্ঠী স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের নানাভাবে সহযোগিতা করে। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বাঙালির কৃতি সন্তানদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানিদের এ দোসররা রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস নামে বিভিন্ন ঘাতক বাহিনী গড়ে তোলে। তারা এ দেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী ও সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের স্মরণে ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পাক হানাদার বাহিনী শেষ পর্যন্ত কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পাকিস্তান সরকার এ যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার জন্য ৩রা ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী যৌথভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারত সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক লে: জেনারেল নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লে: জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে। দেশ শত্রুমুক্ত হল। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলে –

- i. পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের শাসনের অবসান ঘটে
- ii. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হন
- iii. আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

২. ছয় দফা কর্মসূচিকে বাঙালিদের মুক্তির সনদ বলা হত, কেননা—

- i. এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধারণার বিকাশ ঘটায়
- ii. এর মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল
- iii. এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিনে বাংলার দামাল ছেলেরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। ভাষার জন্য এতবড় আত্মত্যাগের ঘটনা পৃথিবীতে বিরল।

৩. ভাষা আন্দোলন থেকে মূলত শিক্ষা লাভ করা যায়—

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| ক. অধিকার আদায় | খ. জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি |
| গ. দেশপ্রেম | ঘ. সংগ্রামী চেতনার উদ্বুদ্ধকরণ |

৪. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা স্বীকৃতি পায় কোন সালে—

- | | |
|---------|---------|
| ক. ১৯৫২ | খ. ১৯৫৪ |
| গ. ১৯৫৬ | ঘ. ১৯৬২ |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যকার প্রদত্ত বৈষম্য :

১. দেশ রক্ষার তিনটি সদর দপ্তরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে	১. পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সদর দপ্তরই ছিল না।
২. পশ্চিম পাকিস্তানে সমর অস্ত্র কারখানা ছিল	২. পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সমর অস্ত্র কারখানা ছিল না।
৩. সেনাবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্য ছিল ৯৫ ভাগ	৩. সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য ছিল ৫ ভাগ
৪. দেশ রক্ষা খাতে সিংহ ভাগ খরচ হতো পশ্চিম পাকিস্তানে	৪. পূর্ব পাকিস্তানে দেশ রক্ষা খাতের খরচ খুবই নগণ্য
৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর উচ্চ পদে নিয়োজিত সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের	৫. পূর্ব পাকিস্তানের দেশ রক্ষা বাহিনীর উচ্চ পদে কোনো বাঙালি ছিল না।

- ক. এ ধরনের বৈষম্যের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানিদের মূল দাবী কী ছিল ?
- খ. পশ্চিম পাকিস্তানিরা কীভাবে বাঙালি সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে অপপ্রয়াস চালায় ?
- গ. পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি তালিকা তৈরি কর।
- ঘ. ওপরে বর্ণিত বৈষম্য পূর্বপাকিস্তানিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।
২. রাইসার বাবা নাদিম আলী একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। সে সময় তিনি সরকারি অফিসের গাড়ি চালাতেন। চারিদিকে যুদ্ধের সংবাদ শুনে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজের নাম লেখালেন। এরপর থেকে তিনি সরাসরি অনেক স্থানে যুদ্ধে অংশ নেন। ডিসেম্বরে এক অভিযানে তিনি তাঁর দুটি পা হারান। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। নাদিম আলী ফিরে আসেন তার বাড়িতে। পা হারানোর কারণে নাদিম আলী তার চাকরিটি আর ফিরে পাননি।
- ক. বাংলাদেশে স্বাধীনতা দিবস কবে ?
- খ. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. স্বাধীনতা অর্জনে নাদিম আলীর ন্যায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ভারত সরকার ও জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করেছে, বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও ঘোষণাপত্র (The Declaration and Proclamation of Independence of Bangladesh)

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে ‘স্বাধীনতার ঘোষণা’ বলা হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সরকার গঠন করতে না দিয়ে বিলম্বে আহুত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতসহ নানা টালবাহানা শুরু করলে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার শ্লোগান দিতে থাকে। এই পটভূমিতে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” পূর্ব বাংলার জনগণ এই ঘোষণার পর স্বাধীনতা লাভের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী যখন পূর্বপাকিস্তানের নিরস্ত্র মানুষের ওপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে— ওই রাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেস্টার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণার একটি তারবার্তা চট্টগ্রামে প্রেরণ করতে সক্ষম হন। উক্ত বার্তায় লেখা ছিল “আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন”। বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক এই ঘোষণা ২৬শে মার্চ সকালে চট্টগ্রাম শহরে সাইক্লোকপি করে বিতরণ করা হয়, মাইকিং করে জানানো হয়। দেশের অন্যান্য স্থানেও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা প্রচারিত হয়। ২৬শে মার্চ দুপুর বেলা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে এম এ হান্নান প্রথম দেশবাসীকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা জানিয়ে বক্তৃতা করেন। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় কালুর ঘাটে চালু হওয়া স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে এম এ হান্নান, আবুল কাশেম সন্দ্বীপসহ অনেকেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা প্রচার করেন। ২৭শে মার্চ থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত উক্ত বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমানসহ আরো অনেকেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা জানিয়ে একাধিক বিবৃতি পাঠ করেন।

২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। উক্ত সরকার ঐ দিনই ঘোষিত স্বাধীনতার যৌক্তিকতা, পরিপ্রেক্ষিত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একটি ঘোষণাপত্র জারি করে। এটিকে ‘স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র’ বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ শাসনের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে স্বাধীনতার একটি ঘোষণাপত্র জারি করেছিল। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে ইংল্যান্ডের অধীনতা থেকে আমেরিকার কলোনিগুলো (উপনিবেশ) স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে সিনেটে যে ঘোষণা প্রদান করে তাকে ইতিহাসে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বলা হয়। ১৯৭০-৭১ সালে পাকিস্তানে যে সব রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল তার ওপর ভিত্তি করেই ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করতে বাধ্য হন। ঐসব ঘটনার যৌক্তিক ব্যাখ্যা ১০ই এপ্রিল জারিকৃত বাংলাদেশের ‘স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে’ যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছে। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় (মুজিবনগর) নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে উক্ত ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও ঘোষণাপত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক ধারণা লাভ এবং তারা যাতে শিক্ষকদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে পারে সেই লক্ষ্যে স্বাধীনতার সম্পূর্ণ ঘোষণাপত্রটি নিচে উল্লেখ করা হল।

মুজিবনগর, বাংলাদেশ

১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন।

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহবান করেন।

এবং

যেহেতু আহুত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচার ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

এবং

যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ ঢাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের প্রতি উদাস্ত আহবান জানান।

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে অগুণিত গণহত্যা ও নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে এবং যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে।

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন

সেহেতু

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি

এবং

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন, তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভায় অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহবান ও মূলত্ববির ক্ষমতা থাকবে এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্যে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে-কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতা এ ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম। এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি হয়—

ক. ১২ এপ্রিল ১৯৭১ সালে

খ. ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে

গ. ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে

ঘ. ৯ এপ্রিল ১৯৭১ সালে

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতার-ঘোষণাপত্রের মতো পৃথিবীর আর কোন দেশে স্বাধীনতার ঘোষণার সনদ আছে?

ক. যুক্তরাজ্য

খ. যুক্তরাষ্ট্র

গ. ভারত

ঘ. রাশিয়া

৩. বাংলাদেশের তৎকালীন অস্থায়ী সরকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করে—

i. তৎকালীন শাসকশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য

ii. জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য

iii. বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য—

কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i এবং ii

ঘ. i, ii ও iii

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতা ও বর্বরতা বাংলাদেশের মানুষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরাই সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সময়ে বাংলাদেশের কান্ডারি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে ৪-৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা কার্যকরী হয়—

ক. ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ

খ. ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ

গ. ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল

ঘ. ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল

৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে মূল কারণ—

i. নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দেওয়া

ii. সামরিক আইন জারি

iii. বাঙালির উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন

কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i এবং ii

গ. iii

ঘ. i, ii এবং iii

৬. স্বাধীন সার্বভৌম দেশ গঠনের প্রাক্কালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জরুরি কেন?

i. সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান

ii. জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ

iii. শত্রুকে ভয় পাইয়ে দেয়া

কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i এবং ii

ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সামিরা টিভি দেখার সময় আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালে হঠাৎ তাঁর আব্বাকে প্রশ্ন করল, আব্বা আমেরিকা ইংল্যান্ডের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একটি ঘোষণা দিয়েছিল যা তাদের স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রেখেছিল। আমাদের ও কি এরকম ঘোষণাপত্র আছে যা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা করেছে?

ক. মুজিবনগরের পূর্বনাম কী?

খ. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কেন জারি করা হয়েছিল—ব্যাখ্যা কর।

গ. সামিরার প্রশ্নের উত্তরে তার বাবার সম্ভাব্য উত্তর যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের মৌল অধিকার আদায়ের রক্ষাকবচ হল এই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র”—যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায়

ইউরোপ মহাদেশ

অবস্থান ও আয়তন : ইউরোপ মহাদেশ এশিয়ার সঙ্গে সঙ্লগ্ন এবং এর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া অপরাপর মহাদেশের তুলনায় ইউরোপের আকার খুবই ছোট। এ মহাদেশ 35° উত্তর অক্ষরেখা থেকে 91° উত্তর অক্ষরেখা এবং 25° পশ্চিম দ্রাঘিমাঙ্ক থেকে 66° পূর্ব দ্রাঘিমাঙ্কের মধ্যে অবস্থিত। ইউরোপের উত্তরে উত্তর মহাসাগর; দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগর; পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর, ইউরাল নদী ও ইউরাল পর্বত এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত। এ মহাদেশের আয়তন প্রায় ২ কোটি ৩২ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৯৬ বর্গ কিলোমিটার (উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৮)। যা পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ।

ভূপ্রকৃতি : ভূপ্রকৃতি অনুসারে ইউরোপ মহাদেশকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

- ১। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের পার্বত্য মালভূমি
- ২। মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ সমভূমি
- ৩। মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের মালভূমি
- ৪। দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্যভূমি

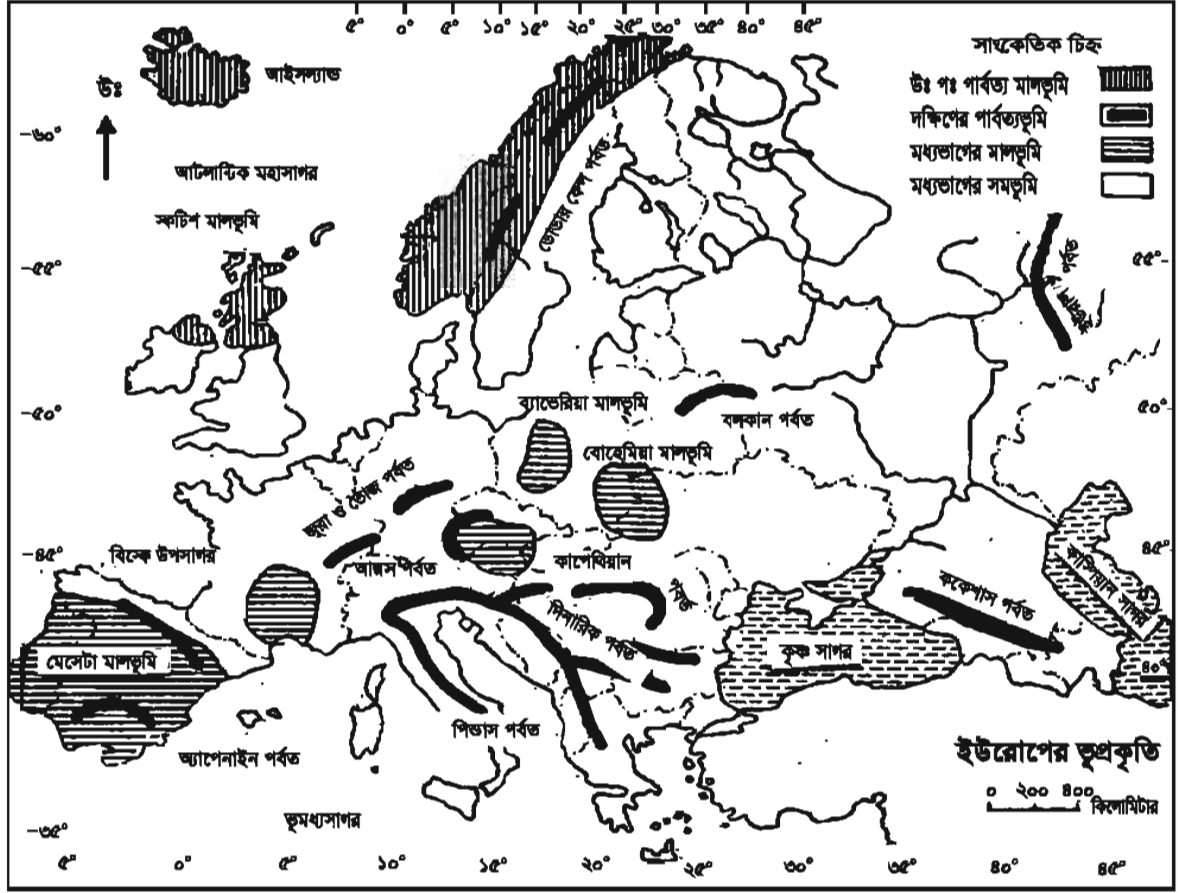
১। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের পার্বত্য মালভূমি : স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপে নরওয়ে, সুইডেন, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের উত্তরাংশে এ পার্বত্য অঞ্চলটি অবস্থিত। এ অঞ্চল পূর্বে কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত পার্বত্যভূমি ছিল। কিন্তু কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে অনুচ্চ মালভূমিতে পরিণত হয়েছে। এ অঞ্চলের স্ক্যান্ডিনেভিয়া মালভূমির উত্তরে কিওলেন ও দক্ষিণে ডোভার ফেঞ্চ পর্বত অবস্থিত। স্কটল্যান্ডের উত্তরে স্কটিশ উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে গ্রাম্পিয়ান পর্বতমালা অবস্থিত। গ্রাম্পিয়ানের বেন নেভিস যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এ শৃঙ্গটির উচ্চতা প্রায় ১৩৪৪ মিটার।

২। মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ সমভূমি : ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্কে উপসাগরের উপকূল থেকে পূর্ব দিকে ইউরাল পর্বতমালা এবং উত্তরে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে মধ্য ইউরোপের মালভূমি অবধি এ সুবিশাল সমভূমি বিস্তৃত।

৩। মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের মালভূমি : দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চল স্পেনে মেসেটা, জার্মানিতে ব্যাভেরিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়াতে বোহেমিয়া এবং ফ্রান্সে সেন্ট্রাল মেসেটা প্রভৃতি মালভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। মধ্যভাগের এ উচ্চভূমি এককালে স্পেন ও ফ্রান্সের মালভূমি থেকে ককেশাস ও আনাতোলিয়ার উচ্চভূমি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কালক্রমে এ উচ্চভূমি ক্ষয় হয়ে এবং কোনো কোনো স্থানে চ্যুতির ফলে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

৪। দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্যভূমি : ইউরোপের দক্ষিণাংশে অবস্থিত পশ্চিমে আটলান্টিক উপকূল থেকে পূর্বে কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত এ পার্বত্য অঞ্চল বিস্তৃত। এ পার্বত্যভূমির কেন্দ্রে অবস্থিত আল্পস পর্বত থেকে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের নানাদিকে বিভিন্ন পর্বতমালা বিস্তৃত হয়েছে। বলকান উপদ্বীপে এর প্রথম শাখা দিনারিক আল্পস এবং গ্রীসে পিন্ডাস নামে পরিচিত। দ্বিতীয় শাখা কার্পেথিয়ান নামে হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়ায় বিস্তৃত। তৃতীয় শাখা অ্যাপেনাইন নামে সিসিলি থেকে ইতালির উত্তর দিকে বিস্তৃত।

স্পেনের পিরেনিজ ও সিয়েরা নেভাডা, ফ্রান্সের সিভেনিজ প্রভৃতিও এ আল্পস পর্বতেরই শাখা। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট ব্লাঙ্ক (৪,৮০৭ মিটার) দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্স ও ইতালির সীমানায় অবস্থিত। এটি সর্বদা তুষারাবৃত থাকে। জুরা ও ভোজ ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বত দুইটি আল্পসের উত্তরে অবস্থিত। এ পার্বত্য অঞ্চলের মাঝে মাঝে অনেক উর্বর সমভূমি রয়েছে।



চিত্র : ইউরোপের ভূপ্রকৃতি

নদী ও হ্রদ

ইউরোপ নদীবহুল মহাদেশ। এর প্রধান জলবিভাজিকা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বলে অধিকাংশ নদী সমতল ভূমির ওপর দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলো প্রায় সর্বত্রই নাব্য এবং শিল্প ও বাগিচের সহায়ক। নিম্নে নদীগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল—

ভলগা : ইউরোপের দীর্ঘতম নদী ভলগা। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৭৬৬ কিলোমিটার। পশ্চিম রাশিয়ার ভলডাই পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে রাশিয়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে।

দানিযুব : ইউরোপের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী দানিযুব। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৮৩৫ কিলোমিটার। দানিযুব ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে উৎপন্ন হয়ে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ৬টি দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণ সাগরে পড়েছে।

নিপার, নিস্টার ও ডন : এই তিনটি নদী কৃষ্ণ সাগরে পড়েছে। নিপার এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২,২৮৪ কিলোমিটার, ডন—এর দৈর্ঘ্য ২,১৪৬ কিলোমিটার এবং নিস্টারের দৈর্ঘ্য ২,৩৩৬ কিলোমিটার।

পেচোরা ও ডুইনা : এই নদী দুইটি উত্তর সাগরে পতিত হয়েছে।

ভিচুলা, ওডার ও এলবা : মধ্যভাগের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ইউরোপের সমভূমি অতিক্রম করে ভিচুলা ও ওডার বাস্টিক সাগরে এবং এলবা উত্তর সাগরে পতিত হয়েছে।

রাইন, রোন ও পো : এই তিনটি নদী আল্পস পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর মধ্যে রাইন উত্তর সাগরে, রোন ভূমধ্যসাগরে এবং পো আড্রিয়াটিক সাগরে পতিত হয়েছে।

ডুরো, টেগাস, গোয়াডালকুইভার ও গোয়াডিয়ানা : স্পেন ও পর্তুগালের মধ্য দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়েছে। সীন নদী ইংলিশ চ্যানেলে, লোআর এবং গ্যাবন বিস্কে উপসাগরে পতিত হয়েছে।

হ্রদ : ইউরোপে অনেক হ্রদ রয়েছে। তার মধ্যে আঙ্গস অঞ্চলের জেনেভা, জুরিখ, ম্যাজোরে, রাশিয়ার ওনেগা, লেভোগা, সুইডেনের ভেনার, ভেটার এবং ফিনল্যান্ডের ইনারি প্রসিদ্ধ।

জলবায়ু

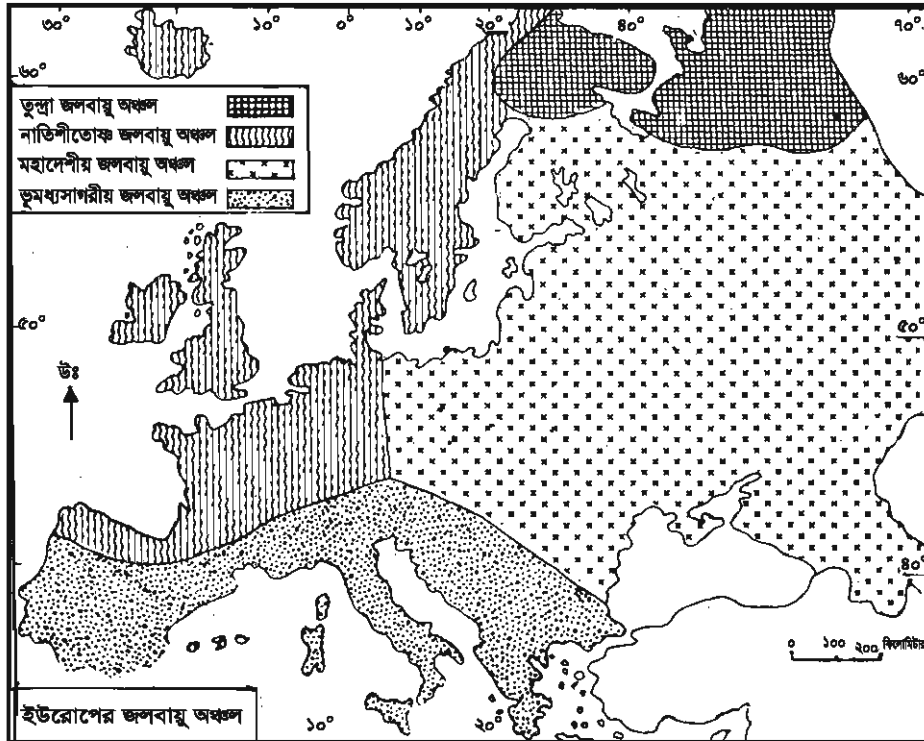
ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সব অঞ্চলই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে, কেবল উত্তরের সামান্য অংশ হিমমণ্ডলে অবস্থিত। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হলেও অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত ইত্যাদির প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক বলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু দেখা যায়।

জলবায়ু অঞ্চল : ইউরোপের জলবায়ুকে চারটি প্রধান জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন—

- ১। তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল
- ২। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল
- ৩। পূর্ব ইউরোপের মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল
- ৪। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল।

১। তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল : স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহের উত্তরাংশ এবং রাশিয়ার উত্তর ভাগ তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল বা হিমমণ্ডলের অন্তর্গত। এ অঞ্চল প্রায় সারা বছর বরফাচ্ছন্ন থাকে। শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী ও গ্রীষ্মকাল স্বল্পস্থায়ী। এই অঞ্চলে সারা বছর তাপমাত্রা হিমাজকের নিচে থাকে। এখানে প্রায় তুষার বৃষ্টি ও বাড় হয়।

২। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল : আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত দেশসমূহ এরূপ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। উষ্ণ উপসাগরীয় ও উত্তর আটলান্টিক স্রোতের প্রভাবে এবং সমুদ্র সান্নিধ্যের জন্য উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। শীতকালে অধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। তবে উষ্ণ ও আর্দ্র পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বছরের অন্যান্য সময়ে বৃষ্টিপাত হয়।



চিত্র ৮.২ : ইউরোপের জলবায়ু অঞ্চল

৩। **পূর্ব ইউরোপের মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল** : ইউরোপের পূর্বাংশ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় এ অঞ্চলের জলবায়ু মহাদেশীয় অর্থাৎ চরমভাবাপন্ন। পূর্ব-পশ্চিমে কোনো পর্বতের অবস্থান না থাকায় উত্তরের শীতল বায়ু দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। শীতকালে শীতের তীব্রতা অধিক এবং গ্রীষ্মকালে বেশি গরম অনুভূত হয়।

৪। **ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল** : ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে সূর্যালোক প্রখর হলেও সমুদ্র সান্নিধ্যের জন্য উষ্ণতা কম। শীতকালে জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ থাকে। ফলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং গ্রীষ্মকাল শুষ্ক থাকে।

অধিবাসী ও জনসংখ্যা

ইউরোপের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৭২.৭০ কোটি (উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৩)। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক দিয়ে এ মহাদেশের স্থান তৃতীয়। উত্তরের হিমমন্ডলে জনবসতি কম। রাশিয়ার মধ্যভাগে জনবসতি কিছু ঘন। ইউরোপের দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিশেষত ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জার্মানিতে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় জনবসতি সবচেয়ে ঘন।

ইউরোপের অধিবাসীদের অধিকাংশ খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। তবে কিছু অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকও রয়েছে। তুন্দ্রা অঞ্চলে ফিন ও ল্যাপ, রাশিয়ার কসাক ও হাজেজিতে ম্যাসিয়ার জাতি বাস করে। অন্যান্য অংশে শ্বেতকায় ককেশীয় জাতি বাস করে।

বনজ সম্পদ

ইউরোপের স্বাভাবিক উদ্ভিদের মধ্যে পর্ণমোচী বৃক্ষের প্রাধান্য বেশি। ইউরোপের তুন্দ্রা অঞ্চলে শৈবাল জাতীয় ঘাস ও ক্ষুদ্র হিমগুলা ছাড়া কিছুই জন্মে না। তুন্দ্রার দক্ষিণে বার্চ, পাইন, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে। সরলবর্গীয় বনভূমির দক্ষিণে মধ্য ইউরোপে ওক, বীচ, এলম, উইলো প্রভৃতি পতনশীল পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। রাশিয়ার মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত স্থানে স্থানে এ জাতীয় বৃক্ষের বন আছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে কৃষ্ণ ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে স্তেপ অঞ্চল। এখানে বড় গাছ জন্মে না। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোতে ডুমুর, জলপাই, কর্ক ও অন্যান্য দীর্ঘমূল চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মে।

জীবজন্তু

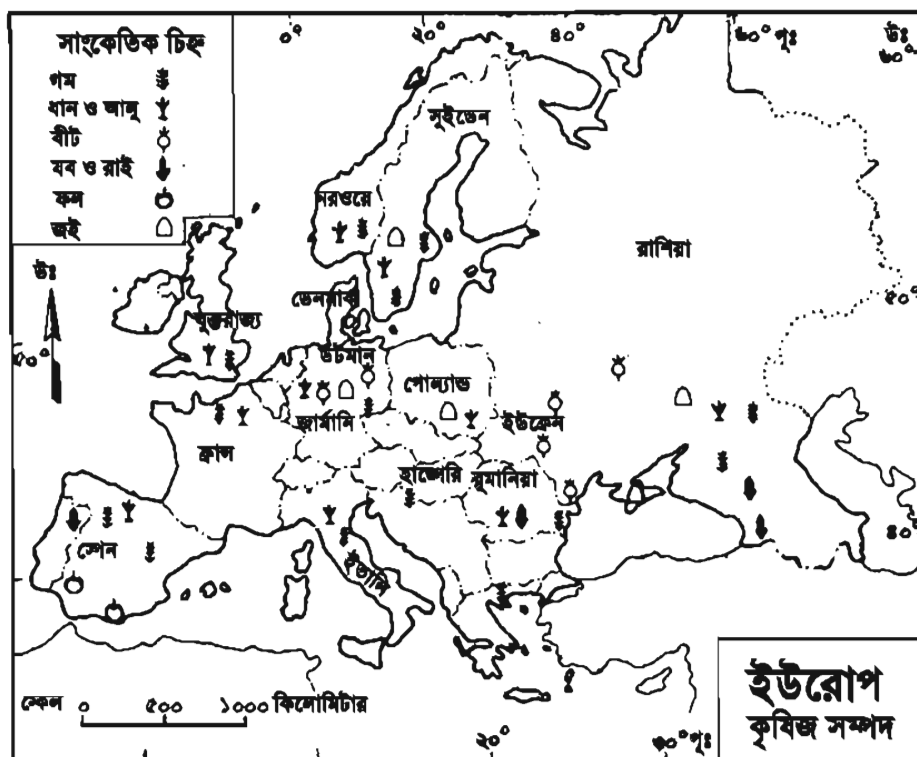
জলবায়ু ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু দেখা যায়। তুন্দ্রা অঞ্চলে শ্বেতভল্লুক, বল্লা হরিণ, সেবল প্রধান জন্তু। তুন্দ্রার দক্ষিণে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চলে বল্লা হরিণ, সেবল, শ্বেতশৃগাল, আরমিন প্রভৃতি লোমশ জন্তু ও পিঙ্গল বর্ণের ভল্লুক বাস করে। মধ্য ইউরোপের বনভূমিতে বন্যশূয়ার ও নেকড়ে বাঘ বাস করে। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে গরু, ঘোড়া, মেঘ, ছাগল, শূয়ার ইত্যাদি প্রতিপালিত হয়।

কৃষিজ সম্পদ

ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ুজনিত কারণে ইউরোপের সর্বত্র কৃষিকাজে উন্নত নয়। তবে সামগ্রিকভাবে এ মহাদেশ কৃষিকাজে উন্নত। এখানকার কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে গম, যব, রাই, জই, বীট, ধান, আলু প্রভৃতি প্রধান। নিম্নে বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্যের বিবরণ দেওয়া হল।

গম : গম উৎপাদনে এ মহাদেশ বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয়। পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৩৫.৬২ ভাগ গম এখানে উৎপন্ন হয়। গম উৎপাদনের উপযোগী অবস্থা এর সর্বত্রই বিদ্যমান। রাশিয়া, ফ্রান্স, ইউক্রেন, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, হাজেজি, সুইডেন, ইতালি প্রভৃতি দেশ গম চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

যব : যে সব স্থানের মৃত্তিকা কম উর্বর এবং বৃষ্টিপাত অধিক নয় সে সব স্থানে যবের চাষ হয়। যব উৎপাদনে রাশিয়া, জার্মানি, ইউক্রেন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও ডেনমার্ক প্রসিদ্ধ।



চিত্র ৮.৩ : ইউরোপের কৃষিজ্ঞ সম্বাদ

রাই : রাশিয়া, পোলাণ্ড, জার্মানি, স্পেন প্রভৃতি দেশ রাই চাষে প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ রাই ইউরোপে উৎপন্ন হয়।

জই : শীতপ্রধান ও আর্দ্র জলবায়ুতে জই-এর চাষ ভাল হয়। এ মহাদেশের রাশিয়া, জার্মানি, পোল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশে প্রচুর জই জন্মে। জই উৎপাদনে রাশিয়া ও জার্মানি বিশ্বে প্রসিদ্ধ।

বীট : ইউরোপ মহাদেশ বীট চাষেও প্রসিদ্ধ। ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়া একত্রে পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বীট উৎপন্ন করে থাকে।

ধান : ইউরোপ মহাদেশের ইতালি, স্পেন ও রাশিয়ায় সামান্য ধান জন্মে।

আলু : এ মহাদেশ আলু উৎপাদনে বিশ্বে প্রসিদ্ধ। রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে অধিক আলু জন্মে।

এছাড়া পশ্চিম ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর কমলালেবু, আঙ্গুর, নাশপাতি, আপেল জন্মে। ইতালি, স্পেন ও গ্রিসে প্রচুর আখরোট, কমলালেবু, জলপাই, ডুমুর, বাদাম ও তুঁতগাছের চাষ হয়।

મહત્વનાં શબ્દો

ইউরোপ মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত উত্তর সাগর পৃথিবীর অন্যতম মৎস্যক্ষেত্র। এখানকার ডগার্স ব্যাংক পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ মৎস্য চারণক্ষেত্র।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্বত মাহের মধ্যে হেরিং, কড, হ্যাডক, হ্যালিবাট, ম্যাকারেলে, শোল, হেক, ডগফিশ, গলদাচিহড়ি প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া তিমি, হাঙর, বিনুক প্রভৃতিও পাওয়া যায়। পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ তিমি মাছ একমাত্র নরওয়েতেই ধরা হয়।

খনিজ সম্পদ

ইউরোপ মহাদেশ খনিজ সম্পদে খুবই সমৃদ্ধশালী। খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা ও আকরিক লোহা প্রধান। এছাড়া খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তামা, বক্সাইট, প্লাটিনাম, ক্রোমাইট, ম্যাংগানিজ প্রভৃতি সম্পদও পাওয়া যায়। নিম্নে এদের বিবরণ দেওয়া হল—

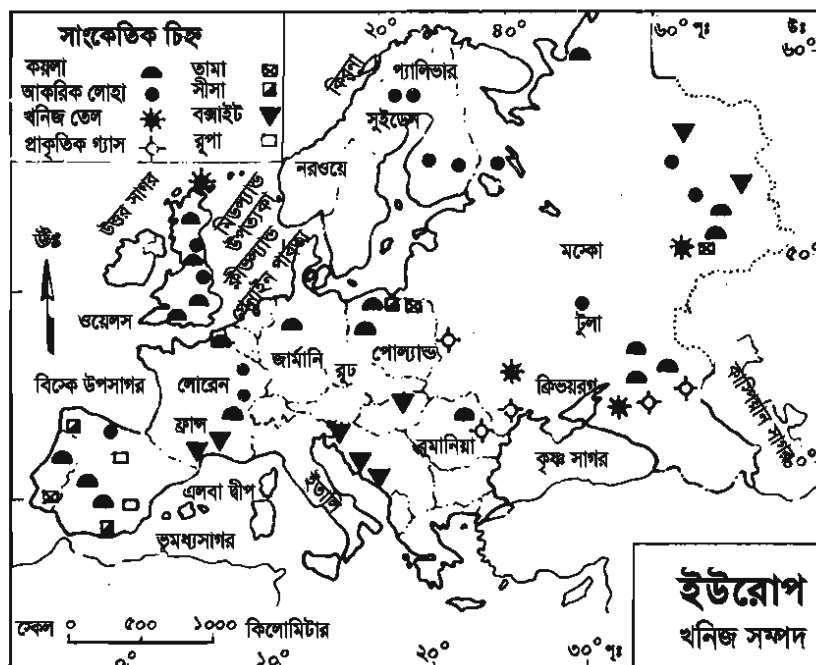
কয়লা : কয়লা ইউরোপ মহাদেশের সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ। যুক্তরাজ্যের মিডল্যান্ড উপত্যকা পেনাইন পার্বত্য অঞ্চল এবং ওয়েলস অঞ্চল, জার্মানির রুঢ় কয়লাক্ষেত্র ও ব্যাভেরিয়া অঞ্চল, ফ্রান্সের অ্যালসেসলোরেন অঞ্চল, রাশিয়ার টুলা অঞ্চল এবং পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়ার সাইলেশিয়া ইউরোপের প্রধান কয়লা উৎপাদনকারী অঞ্চল।

আকরিক লোহা : রাশিয়ার মস্কো, টুলা, ইউরাল; ফ্রান্সের অ্যালসেসলোরেন, সুইডেনের কিবুনা, গ্যালিভার এবং লুসোভারা; যুক্তরাজ্যের ক্লিভল্যান্ড ও মিডল্যান্ড, বিস্কে উপসাগরের তীরে উত্তর স্পেনে এবং ইতালির এলবা দ্বীপে আকরিক লোহা পাওয়া যায়।

খনিজ তেল : রাশিয়ার লেনিনগ্রাড, ইউরাল অঞ্চল যুক্তরাজ্যের উত্তর সাগর এবং রুম্যানিয়ার কার্পেথিয়ান পর্বতমালায় প্রচুর খনিজ তেল পাওয়া যায়। এছাড়া ইউরোপের জার্মানি প্রভৃতি দেশেও তেলখনি রয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস : রাশিয়া প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনে বিশ্বে প্রথম, যুক্তরাজ্য চতুর্থ, নেদারল্যান্ড পঞ্চম এবং নরওয়ে অষ্টম। এছাড়া ইতালি ও জার্মানিতেও গ্যাস পাওয়া যায়।

তামা : রাশিয়া, পোল্যান্ড, স্পেন, জার্মানি, নরওয়ে ও সুইডেনে তামার খনি আছে।



চিত্র ৮.৪: ইউরোপের খনিজ সম্পদ

দস্তা : পোল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, সুইডেন, নরওয়ে, রাশিয়া ও বেলজিয়ামে সামান্য দস্তা পাওয়া যায়।

বক্সাইট : রাশিয়া ও ফ্রান্সে অধিক, হাঙ্গেরি, সাবেক যুগোস্লাভিয়া, ইতালি প্রভৃতি দেশে সামান্য বক্সাইট পাওয়া যায়। এছাড়া রাশিয়া, জার্মানি, চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়ায় ক্রোমাইট ও ম্যাংগানিজ এবং রাশিয়ার ইউরাল পার্বত্য অঞ্চলে প্লাটিনাম পাওয়া যায়।

শিল্প

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, জ্বালানি শক্তি, শ্রমিক, মূলধন ও বাজার বর্তমান থাকায় ইউরোপের দেশগুলো শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। এ মহাদেশের প্রায় সব দেশই শিল্পে উন্নত।

প্রধান শহর ও বন্দর

লন্ডন : টেমস নদীর তীরে অবস্থিত লন্ডন যুক্তরাজ্যের রাজধানী। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

ডাঙি : যুক্তরাজ্যের উত্তর-পূর্ব উপকূলে স্কটল্যান্ডে অবস্থিত সমুদ্রবন্দর এবং পাট শিল্প কেন্দ্র।

প্যারিস : সীন নদীর তীরে অবস্থিত ফ্রান্সের রাজধানী এবং একটি মনোরম শহর। এখানে মোটরগাড়ি নির্মাণ কারখানা এবং কাগজ ও চিনির কল আছে।

আমস্টারডাম : নেদারল্যান্ডস এর রাজধানী এবং প্রধান বাণিজ্য শহর। হীরা কাটার জন্য এ শহর বিখ্যাত।

জুরিখ : সুইজারল্যান্ডের বৃহত্তম নগর এবং একটি প্রসিদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র।

জেনেতা : জেনেতা হ্রদের তীরে অবস্থিত সুইজারল্যান্ডের একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও ঘড়ি নির্মাণের জন্য বিখ্যাত।

ভিয়েনা : দানিযুব নদীর উপত্যকায় অবস্থিত ভিয়েনা অস্ট্রিয়ার রাজধানী, প্রধান শহর ও শিল্প কেন্দ্র।

রোম : ইতালির রাজধানী। শহরটি টাইবার নদীর তীরে সাতটি পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। রোম পৃথিবীর একটি বিখ্যাত প্রাচীন শহর এবং প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাস্কর্যে ঐতিহ্যবাহী।

মস্কো : মস্কোভা নদীর তীরে অবস্থিত মস্কো রাশিয়ার রাজধানী। এটি ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর, শিল্প ও যোগাযোগ কেন্দ্র।

অন্যান্য : ইউরোপের অন্যান্য শহর ও নগরের মধ্যে বার্মিংহাম, গ্লাসগো, বেলফাস্ট, মার্সেই, বুদাপেস্ট, জিব্রাল্টার, স্টকহোম, হামবুর্গ, লেনিনগ্রাড প্রভৃতি প্রধান।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইউরোপের কোন দেশটি আকৃতিগত কারণে লেডিস নামে পরিচিত ?

ক. স্পেন

খ. ফ্রান্স

গ. গ্রিস

ঘ. ইতালি

২. নিম্নের কোন দেশগুলো স্কাভিনেভিয়া নামে পরিচিত ?

i নরওয়ে, সুইডেন, স্কটল্যান্ড, গ্রিস

ii সুইডেন, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স

iii নরওয়ে, সুইডেন, স্টকল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. i ও ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

বনভূমি	বৃক্ষসমূহ	অঞ্চল
সরলবর্গীয়	বার্চ, পাইন, ফার	?
চিরহরিৎ	?	ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল

উপরের সারণি থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩. জিজ্ঞাসা চিহ্নিত কোন অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে ?

ক. তুন্দ্রা

খ. নাতিশীতোষ্ণ

গ. ভূমধ্যসাগরীয়

ঘ. মহাদেশীয়

৪. ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোতে বৃক্ষ জন্মে —

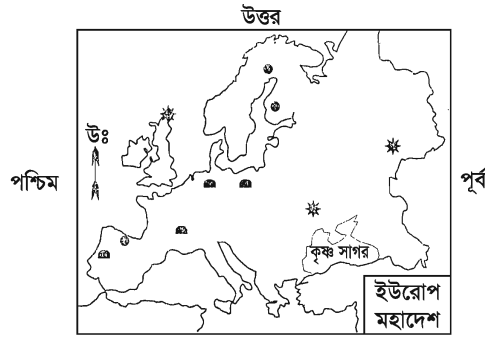
- i এলম, উইলো, বীচ
- ii ডুমুর, জলপাই, কর্ক
- iii রোজউড, অলডার, মেনেল

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



মানচিত্র: ইউরোপের খনিজ সম্পদ

উপরের মানচিত্রের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- ক. ডাণ্ডি কোথায় অবস্থিত ?
 - খ. ইউরোপ মহাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কী? বর্ণনা কর
 - গ. এ মহাদেশের তিনটি খনিজ সম্পদের নাম উল্লেখপূর্বক এগুলো কোন কোন দেশে পাওয়া যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।
 - ঘ. খনিজ সম্পদের সহজ প্রাপ্তি ইউরোপ মহাদেশকে শিল্প সমৃদ্ধ মহাদেশে পরিণত করেছে—বিশ্লেষণ কর।
২. মিমি, ফারিহা, ব্রতী—তিন বান্ধবী ইউরোপের মানচিত্র সংগ্রহ করে এর ভূপ্রকৃতির বিভিন্ন ভাগ চিহ্নিত করে। এভাবে, তারা ইউরোপের বিভিন্ন ভূভাগ যেমন আল্পস পর্বত, মেসেটা মালভূমি মাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক সম্পর্কে জানতে পারে।
- ক. ভূপ্রকৃতি অনুসারে ইউরোপ মহাদেশকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?
 - খ. ইউরোপ মহাদেশের সীমানা বর্ণনা কর।
 - গ. ইউরোপ মহাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে আল্পস পর্বত, মেসেটা মালভূমি এবং মাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক কোন ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তা চিহ্নিত কর।
 - ঘ. “আল্পস পর্বত ইউরোপের ভূপ্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে”—এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।
৩. অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সূচিত হয়। এ বিপ্লবের ফলে এ মহাদেশের জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি কিছু পণ্য উৎপাদন করে অপর মহাদেশের দেশগুলোর তুলনায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। এ খ্যাতি ও সমৃদ্ধির পেছনে প্রাকৃতিক সুবিধা যেমন কাজ করেছে, তেমনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ামকসমূহ অনুকূল প্রভাব ফেলেছে।
- ক. যুক্তরাজ্যের কোন অঞ্চলটি সুতি বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ?
 - খ. ইউরোপের শিল্প উন্নয়নের একটি প্রাকৃতিক নিয়ামক বর্ণনা কর।
 - গ. ইউরোপের মানচিত্র অঙ্কন করে লোহা ও ইস্পাত শিল্প সমৃদ্ধ দুইটি দেশ চিহ্নিত কর।
 - ঘ. শুধু প্রাকৃতিক নিয়ামক অনুকূলে থাকলেই কোনো দেশে শিল্প উৎপাদনে অগ্রগতি লাভ করে না—এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

দশম অধ্যায়

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ

উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার পরই এর স্থান। ১৪৯২ সালে ইতালির বিখ্যাত নাবিক কলম্বাস স্পেনের রাজা ও রানীর অর্থানুকূল্যে ভারতবর্ষ যাওয়ার জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে নিজের অজান্তে যে নতুন ভূখণ্ডে পৌঁছান তা পরবর্তীকালে উত্তর আমেরিকা নামে পরিচিত।

উত্তর আমেরিকার চারপাশে অবস্থিত ছোটবড় বহু দ্বীপ এ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে উত্তর কানাডা সংলগ্ন দ্বীপসমূহ, গ্রীনল্যান্ড, নিউফাউন্ডল্যান্ড, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অবস্থান : এ মহাদেশটি উত্তরে ৮৩° উত্তর অক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে ৮° উত্তর অক্ষরেখা এবং পূর্বে ৫২° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা থেকে পশ্চিমে প্রায় ১৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ মহাদেশের উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর ও পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত।

আয়তন : এ মহাদেশের আয়তন প্রায় ২ কোটি ২৩ লক্ষ ১৪ হাজার ২৩৯ বর্গ কিলোমিটার (উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০০)।

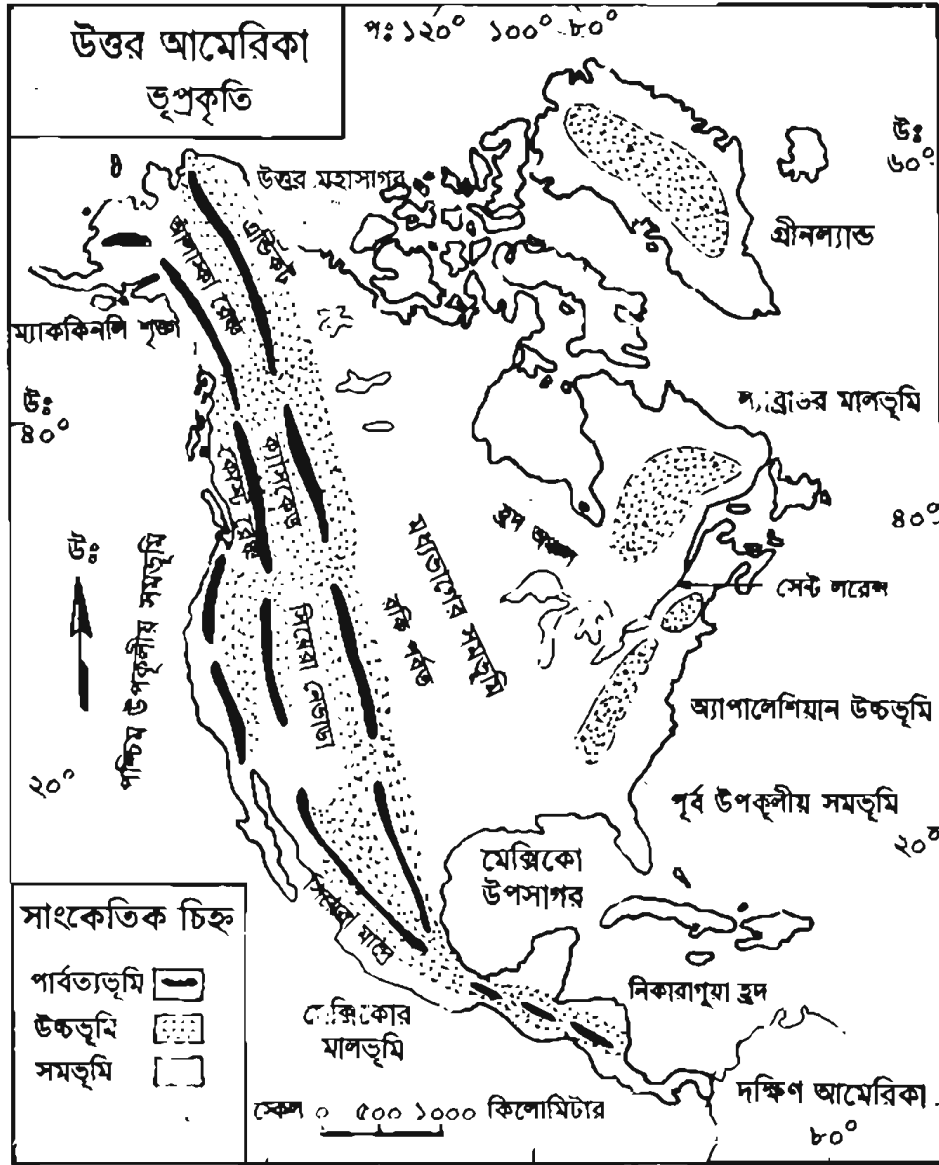
ভূ-প্রকৃতি : উত্তর আমেরিকার ভূমিরূপ বৈচিত্র্যময়—সুউচ্চ পর্বতমালা, বিশাল নদী উপত্যকা, মালভূমি ও সমতল ভূমিতে পূর্ণ। এ কারণে সমগ্র মহাদেশকে পাঁচটি প্রধান ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

- ১। পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল
- ২। পূর্বাঞ্চলের উচ্চভূমি
- ৩। মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চল
- ৪। মধ্য আমেরিকার উচ্চভূমি
- ৫। উপকূলের সমভূমি

১। পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল : উত্তরে আলাস্কা উপদ্বীপ থেকে দক্ষিণে পানামা পর্যন্ত মহাদেশের সমগ্র পশ্চিমাংশ জুড়ে এ পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত। এ পার্বত্য অঞ্চলের গড় উচ্চতা প্রায় ৬০০ মিটার। কিন্তু কোনো কোনো স্থানে এর উচ্চতা ৪,৮৭৭ মিটারেরও অধিক। এ পর্বতশ্রেণী উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমশ সরু, কিন্তু মধ্যভাগের স্থানে স্থানে এটি প্রায় ৩২৫ থেকে ১,৭৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত।

উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত তিনটি সমান্তরাল ভঙ্গি পর্বতশ্রেণী নিয়ে এ পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। যুক্তভাবে এগুলোকে কর্ডিলেরা বলা হয়। এসব পর্বতশ্রেণীর মধ্যে পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত রকি পর্বতশ্রেণীই প্রধান। এটি আলাস্কা থেকে মেক্সিকোর দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। আলাস্কায় রকির উত্তরাংশের নাম এন্টিকট পর্বত এবং মেক্সিকোতে রকির দক্ষিণ প্রান্তের নাম পূর্ব সিয়েরা মাদ্রে পর্বত। রকির পশ্চিম দিকের অর্থাৎ মধ্যভাগের পর্বতশ্রেণী উত্তর থেকে দক্ষিণে আলাস্কা রেঞ্জ, ক্যাসকেড, সিয়েরা নেভাডা ও পশ্চিম সিয়েরা মাদ্রে নামে অভিহিত। আলাস্কা রেঞ্জের ম্যাককিনলি শৃঙ্গ (৬,১৯৪ মিটার) উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ। পশ্চিমের পর্বতশ্রেণীটির উত্তরাংশ সেন্ট এলিয়াস আলস ও দক্ষিণাংশ কোস্ট রেঞ্জ বা উপকূল পর্বত নামে পরিচিত। রকি এবং মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণীর মধ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণে ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ইডাহো মালভূমি, গ্রেটবেসিন, কলোরাডো ও মেক্সিকো মালভূমি অবস্থিত।

২। পূর্বাঞ্চলের উচ্চভূমি : এ উচ্চভূমির উত্তর প্রান্তে গ্রীনল্যান্ড দ্বীপ একটি মালভূমি, মধ্যভাগে ল্যাব্রাডর মালভূমি ও নিউ ইংল্যান্ড উচ্চভূমি এবং দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় ফ্লোরিডা দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত অ্যাপালেশিয়ান উচ্চভূমি অবস্থিত।



চিত্র ৯.১ : উত্তর আমেরিকার ভূপ্রকৃতি

৩। মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চল : এটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অঞ্চল। সমগ্র উত্তর আমেরিকার প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ এ অঞ্চলে অবস্থিত। উত্তরে উত্তর মহাসাগর থেকে দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত এটি বিস্তৃত এবং পূর্ব ও পশ্চিমের উচ্চভূমির ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত। এর মধ্যাংশ সামান্য উচ্চ এবং উত্তর ও দক্ষিণাংশ উপকূলের দিকে ক্রমশ ঢালু। এর উত্তরাংশে উত্তর আমেরিকার হ্রদ অঞ্চল এবং দক্ষিণাংশে মিসিসিপি নদীর অববাহিকা অবস্থিত।

৪। মধ্য আমেরিকার উচ্চভূমি : মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী অংশের নাম মধ্য আমেরিকা। মেক্সিকোর মালভূমি এ অঞ্চলের উত্তরাংশে অবস্থিত। কর্ডিলেরার দক্ষিণাংশ অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম সিলেরা মাদ্রে এ অঞ্চলের প্রধান ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এ পার্বত্য অঞ্চলে কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে। নিকারাগুয়া এ অঞ্চলের প্রধান হ্রদ।

৫। উপকূলের সমভূমি : উত্তর আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। পূর্ব দিকের সমভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগরের সমভূমির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পশ্চিম উপকূলের সমভূমি খুবই সংকীর্ণ।

নদী ও হ্রদ

উত্তর আমেরিকা নদীবহুল মহাদেশ। রকি পর্বত উত্তর আমেরিকার প্রধান জলবিভাজিকা। রকির বরফগলা পানি, বৃষ্টির পানি ও হ্রদ থেকে এ মহাদেশের প্রায় সকল নদীই উৎপন্ন হয়েছে। এছাড়া অ্যাপালেশিয়ান উচ্চভূমি থেকেও কতকগুলো নদীর সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তরবাহিনী নদীর মধ্যে ম্যাকেনজি, নেলসন, সাসকাচুয়ান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ম্যাকেনজি নদী স্নেভ হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর সাগরে এবং নেলসন নদী উইনিপেগ হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে হাডসন উপসাগরে পতিত হয়েছে।

পশ্চিমবাহিনী নদীগুলোর মধ্যে ইউকন, ফ্রেজার ও কলম্বিয়া প্রধান নদী। এ নদীগুলো প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। তবে এ অঞ্চলের কলোরাডো নদী গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন নামে এক গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে পতিত হয়েছে। এ গিরিখাতটি ১.৬ কিলোমিটার গভীর, ৬ থেকে ১৯ কিলোমিটার চওড়া এবং প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ। তাই কলোরাডো নদীর গিরিখাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন জগদ্বিখ্যাত।

দক্ষিণবাহিনী নদীর মধ্যে মিসিসিপি (৪,০০০ কিলোমিটার) ও রিও-গ্র্যান্ডি নদী প্রধান। মিসিসিপি-মিসৌরি একত্রে প্রায় ৮,০৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ। এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। মিসিসিপি মিনেসোটার হ্রদ অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে মেক্সিকো উপসাগরে পতিত হয়েছে। মিসৌরি মিসিসিপির প্রধান উপনদী।

পূর্ববাহিনী নদীগুলোর মধ্যে সেন্ট লরেন্স, ডেলওয়ার, পটোম্যাক, সাসকুইহানা ও হাডসন প্রধান। সেন্ট লরেন্স নদী অন্টারিও হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে সেন্ট লরেন্স উপসাগরে পতিত হয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত নায়াগ্রা নদীতে অবস্থিত।

হ্রদ : উত্তর আমেরিকায় অনেকগুলো প্রসিদ্ধ হ্রদ রয়েছে। কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সুপিরিয়র, মিশিগান, হিউরন, ইরি ও অন্টারিও এ পাঁচটি হ্রদ অবস্থিত। সুপিরিয়র পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাদু পানির হ্রদ। এছাড়া মহাদেশের উত্তরে কানাডার গ্রেট বিয়ার গ্রেট স্নেভ, আখাবাস্কা, রেইনডিয়ার, উইনিপেগ হ্রদ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকের বৃহৎ লবণ হ্রদও প্রসিদ্ধ। শীতকালে কানাডার হ্রদগুলোর পানি জমে বরফে পরিণত হয়।

জলবায়ু

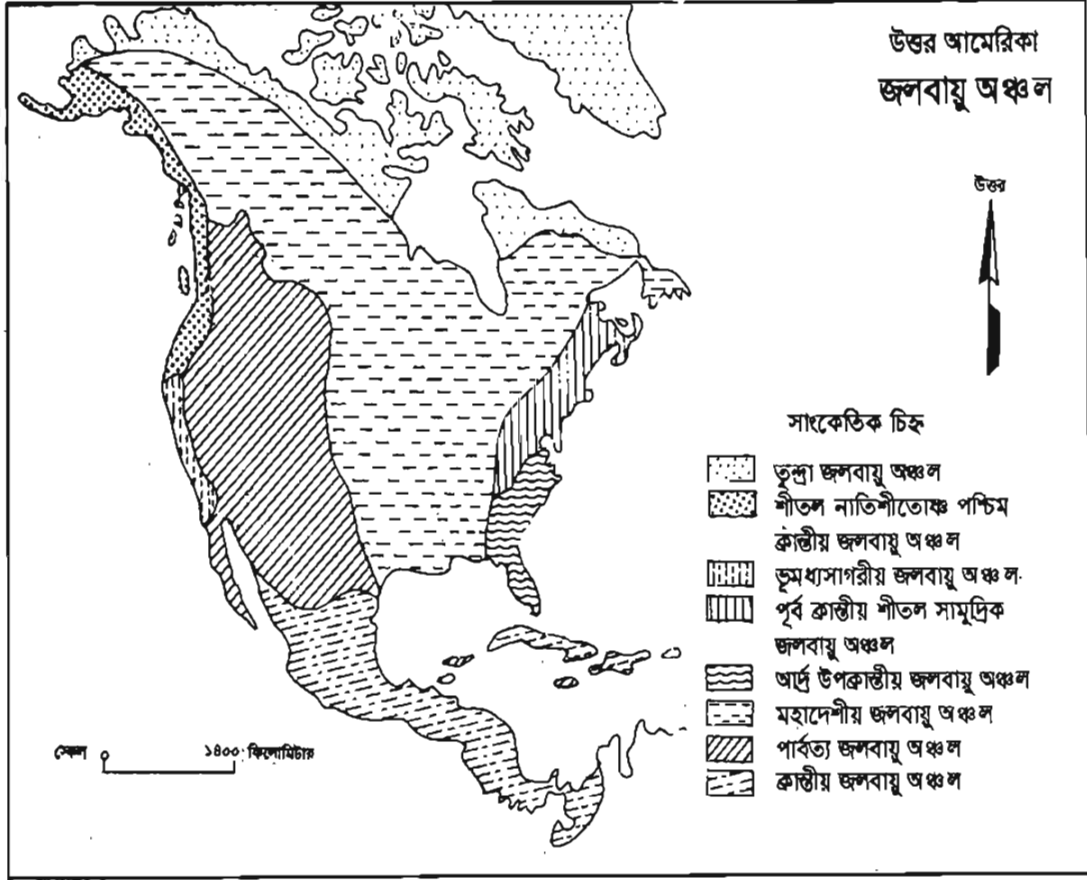
উত্তর আমেরিকার ভূপ্রকৃতি এ মহাদেশের জলবায়ুর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিমে রকি পর্বতমালা এবং পূর্বে অ্যাপালেশিয়ান উচ্চভূমির অবস্থানের ফলে উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগে সমুদ্রবায়ু প্রবেশ করতে পারে না। এ মহাদেশের পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কোনো পর্বত না থাকায় শীতকালে উত্তর দিক থেকে আগত শীতল বায়ু দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগরের উপকূল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। ফলে মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চলকে শীতল রাখে। আবার গ্রীষ্মকালে মেক্সিকো উপসাগর থেকে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ু হাডসন উপসাগর পর্যন্ত এলাকার জলবায়ুকে উষ্ণ রাখে।

জলবায়ু অঞ্চল : অক্ষাংশ, সমুদ্র সান্নিধ্য, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাবে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম জলবায়ু দেখা যায়।

১। **তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল :** ৬৬.৫০ উত্তর মেরুবৃত্তের উত্তরে অবস্থিত আলাস্কা, কানাডা, গ্রীনল্যান্ড, ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ এবং পার্শ্ববর্তী দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ বছরের অধিকাংশ সময় তুষারাবৃত থাকে। দীর্ঘস্থায়ী শীতকালে এখানে তীব্র শীত অনুভূত হয়।

২। **শীতল নাতিশীতোষ্ণ পশ্চিম ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল :** আলাস্কা থেকে কলম্বিয়া নদীর মধ্যবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলীয় এলাকায় নাতিশীতোষ্ণ সমুদ্রবায়ু প্রবাহিত হয়। উষ্ণ আলাস্কা স্রোত এবং সমুদ্র সান্নিধ্যের জন্য এখানে সমভাবাপন্ন জলবায়ু অনুভূত হয়। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৭ সেন্টিমিটার।

৩। **ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল :** ৩০° থেকে ৬০° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যবর্তী পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অনুভূত হয়। গ্রীষ্মের দিনগুলো উষ্ণ ও শুষ্ক এবং শীতের দিনগুলো মৃদু উষ্ণ ও আর্দ্র। পশ্চিমা বায়ু দ্বারা এখানে শীতকালে বৃষ্টি হয়। তবে বছরে ২৫ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয় না।



চিত্র ৯.২ : উত্তর আমেরিকার জলবায়ু অঞ্চল

৪। পূর্ব ক্রান্তীয় শীতল সামুদ্রিক জলবায়ু অঞ্চল : উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলে শীতল ল্যাভ্রাডর স্রোতের প্রভাবে বছরের সবসময় জলবায়ু শীতল থাকে। গ্রীষ্মকাল মৃদুস্থায়ী, শীত ঋতু অধিক শীতল। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা 10° থেকে 20° সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকে এবং শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার।

৫। আর্দ্র উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এ জলবায়ু অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতম মাসের তাপমাত্রা 26° সেলসিয়াস এবং শীতকালে তাপমাত্রা 9° থেকে 13° সেলসিয়াস থাকে। উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে বছরের অধিকাংশ সময় বৃষ্টি হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাত কেন্দ্রীয় অংশে প্রায় ১০২ সেন্টিমিটার এবং উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১৫২ সেন্টিমিটার।

৬। মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল : মহাদেশের মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চলে মহাদেশীয় জলবায়ু দেখা যায়। হাডসন উপসাগর থেকে আগত বায়ুর প্রভাবে এখানে শীতকালে তীব্র শীত এবং গ্রীষ্মকাল উষ্ণ থাকে। মেক্সিকো উপসাগরের উপকূল থেকে মহাদেশের অভ্যন্তরে বৃষ্টিপাত ক্রমশ হ্রাস পায়।

৭। পার্বত্য জলবায়ু অঞ্চল : রকি পর্বত এবং পার্শ্ববর্তী মালভূমি অংশে অধিক উচ্চতার জন্য গড় তাপমাত্রার পরিমাণ কম। শীতের দিনগুলো শীতলতর এবং গ্রীষ্মের দিনগুলো কম উষ্ণ থাকে।

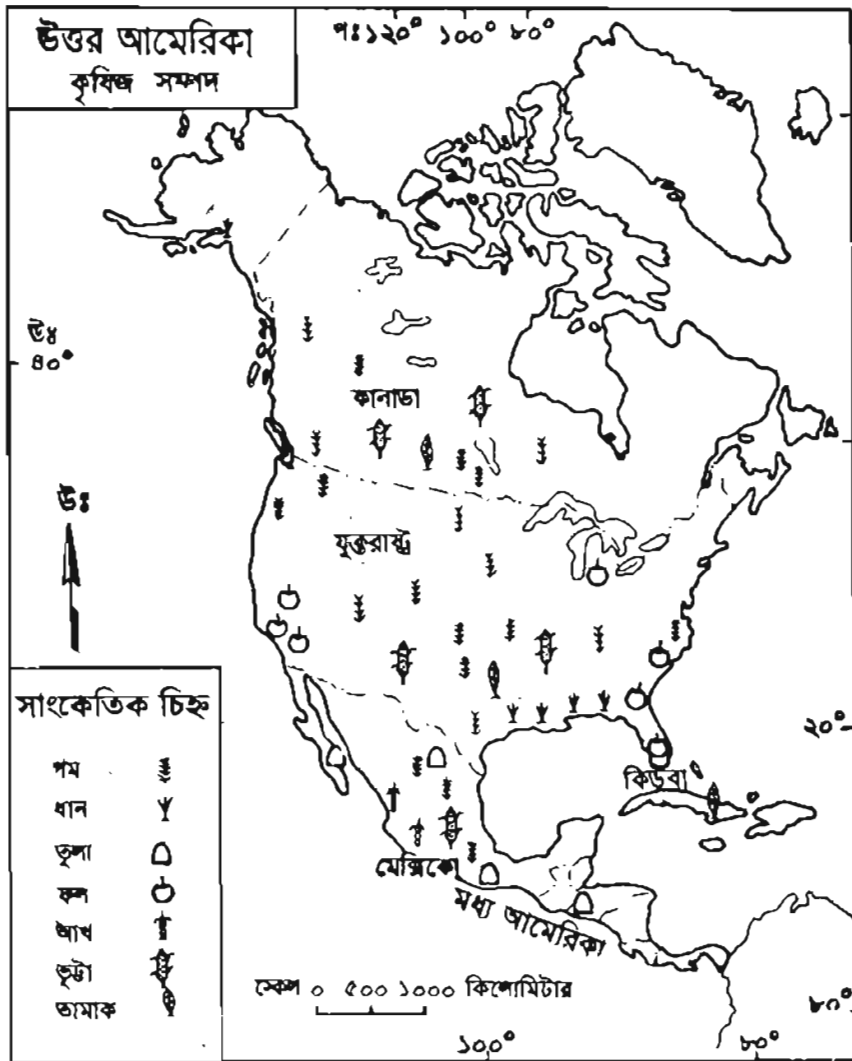
৮। ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল : পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মধ্য আমেরিকায় এ জলবায়ু অনুভূত হয়। অধিক উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের সুমম বন্টন এ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। এ জলবায়ু অঞ্চলে টর্নেডো ও হারিকেন হয়ে থাকে।

অধিবাসী ও জনসংখ্যা

উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ লোক ইউরোপীয়দের বংশধর। এদের মধ্যে অধিকাংশ ব্রিটিশ, বাকি ফরাসি, স্পেনীয় ও জার্মান। পশ্চিম উপকূলে অল্পসংখ্যক চীনা ও জাপানি বাস করে। কানাডার অধিবাসীগণ প্রধানত ইংরেজ ও ফরাসিদের বংশধর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী ইংরেজদের বংশধর, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার অধিবাসী স্পেনীয়দের বংশধর।

এ মহাদেশের আদিম জনগোষ্ঠীর নাম রেড ইন্ডিয়ান। এদের সংখ্যা খুব কম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও মধ্য আমেরিকায় বহু নিগ্রো বাস করে। এদের বর্ণ কৃষ্ণ। তুল্লা অঞ্চলে অল্পসংখ্যক পিঞ্জল বর্ণের এস্কিমো বাস করে। এরাও এ মহাদেশের আদিম অধিবাসী। বর্তমানকালে পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে বহু মেধাবী গবেষক, দক্ষ কারিগর, বিজ্ঞানী প্রভৃতি এ মহাদেশে বসবাস করছে।

এ মহাদেশে প্রায় ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাস করে। আয়তনের তুলনায় এ জনসংখ্যা খুবই কম। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১৪ জন লোক বাস করে (উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৩)। মহাদেশের পূর্বাংশে ও পূর্ব উপকূলে জনবসতি বেশি। আবার তুল্লা ও পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতি অতি বিরল।



চিত্র ৯.৩ : উত্তর আমেরিকার কৃষিজ সম্পদ

কৃষিজ সম্পদ

ভূপ্রকৃতি, উর্বর মৃত্তিকা, অনুকূল জলবায়ু, মূলধনের সহজ লভ্যতা ইত্যাদি উত্তর আমেরিকাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কৃষিপ্রধান মহাদেশে পরিণত করেছে। গম, ভুট্টা, ধান, আখ, তামাক, তুলা ইত্যাদি এ মহাদেশের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। নিম্নে উত্তর আমেরিকার প্রধান কৃষিজ দ্রব্যের বিবরণ দেওয়া হল।

গম : গম উত্তর আমেরিকার সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য। কানাডার দক্ষিণাংশ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশ উন্নতমানের গম উৎপাদনে পৃথিবী বিখ্যাত। এ কারণে এ অঞ্চলকে ‘পৃথিবীর রুটির বুড়ি’ বলা হয়। এছাড়া মেক্সিকোতেও প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। এ মহাদেশ গম রপ্তানিতে বিখ্যাত।

ভুট্টা : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় প্রচুর ভুট্টা জন্মে। সাধারণত অনুর্বর ও স্বল্প বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে ভুট্টার চাষ হয়। এ মহাদেশ প্রচুর ভুট্টা রপ্তানি করে থাকে।

ধান : ধান উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এ মহাদেশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জও ধানের চাষ হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় এ মহাদেশ থেকে বিশ্ববাজারে চাল রপ্তানি হয়।

আখ : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও মেক্সিকোর দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর আখ জন্মে। তবে এদের মধ্যে আখ উৎপাদনে কিউবা উল্লেখযোগ্য।

তামাক : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও কিউবা তামাক চাষে প্রসিদ্ধ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তামাক রপ্তানি করে।

তুলা : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর তুলা উৎপাদন করে। এছাড়া মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায়ও প্রচুর তুলা জন্মে।

অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য : অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে বীট, কফি, কোকো, রবার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর ভূমধ্যসাগরীয় ও ক্রান্তীয় ফল পাওয়া যায়। এর মধ্যে আঙ্গুর, কমলালেবু, আপেল, আনারস, কলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বনজ সম্পদ

এ মহাদেশে তুন্ড্রা অঞ্চলের দক্ষিণে সুবিশাল সরলবর্গীয় বনভূমি দেখা যায়। এখানে পাইন, ফার, বার্চ, স্পুস প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। উত্তর-পশ্চিমের বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে ঘন বনভূমি রয়েছে। এখানে রোজউড, ফার, অলডার ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে। সরলবর্গীয় বনভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে পর্ণমোচী বনভূমিতে ওক ও মেন্ডেল বৃক্ষ জন্মায়। উচ্চভূমিতে সরলবর্গীয় ও পর্ণমোচীর মিশ্রিত বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিম উপকূলের মধ্যভাগে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে নানা প্রকার ফলের গাছ জন্মে। মধ্য আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উষ্ণ ও আর্দ্র ভূমিতে চিরহরিৎ বনভূমি রয়েছে।

জীবজন্তু

এ মহাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে শ্বেতশৃগাল, শ্বেতভল্লুক, আরমিন, সেবল, নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ প্রভৃতি দেখা যায়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মেষ, শূয়ার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ফলে এখানে দুধ, মাংস, পশম এবং বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত শিকাগোর চারদিকে তৃণভূমি থাকায় সেখানে ব্যাপকভাবে পশুপালন হয়।

মৎস্য সম্পদ

এ মহাদেশের হ্রদ, নদী এবং সমুদ্র থেকে প্রচুর মাছ ধৃত হয়। মহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে ধৃত সামুদ্রিক মাছের মধ্যে কড, হেরিং, স্যামন, হ্যালিবাট, টুনা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমে গভীর প্রশান্ত মহাসাগরে বহু তিমি ধরা পড়ে। উত্তরের উত্তর মহাসাগরে অনেক তিমি ও সীল পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদ

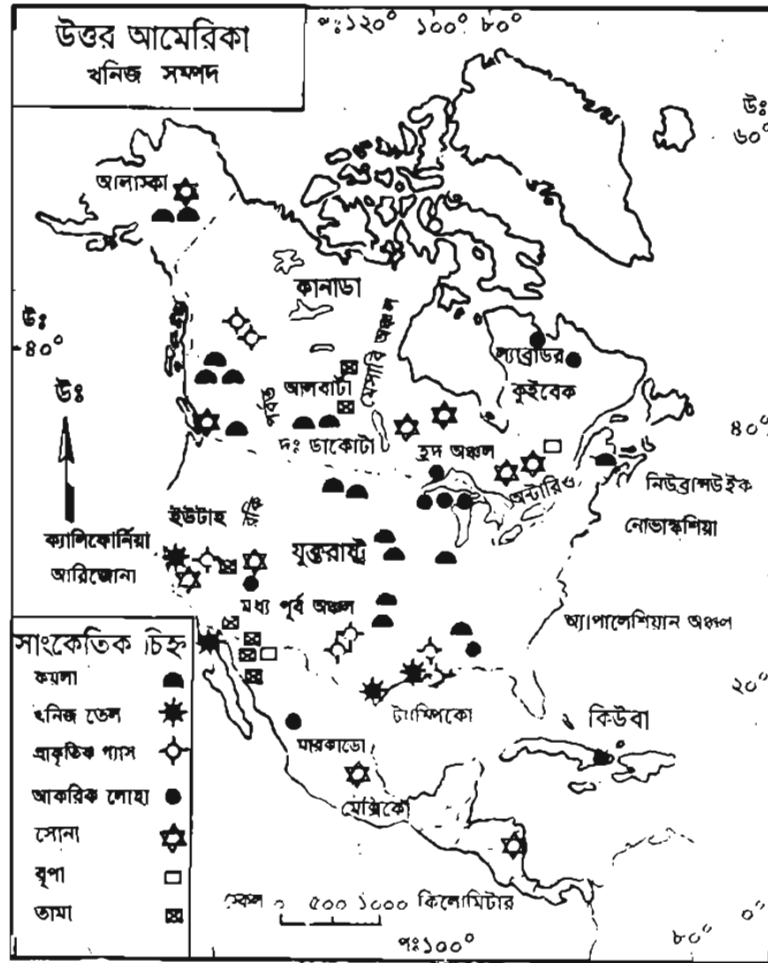
উত্তর আমেরিকা খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় এ মহাদেশে অধিক পরিমাণ খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, আকরিক লোহা, সোনা, প্লাটিনাম, রূপা, তামা প্রভৃতি প্রধান। এদের বিবরণ নিয়ে দেওয়া হল—

কয়লা : কয়লা সম্পদে উত্তর আমেরিকা সমৃদ্ধশালী। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ কয়লা এ মহাদেশে সঞ্চিত রয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্রই কয়লার খনি রয়েছে। এছাড়া কানাডার নোভাস্কশিয়া এবং মেক্সিকোতেও কয়লা পাওয়া যায়।

খনিজ তেল : উত্তর আমেরিকা খনিজ তেল সম্পদে সমৃদ্ধশালী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিগুলো টেক্সাস, লুইজিয়ানা, ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউব্রান্সউইক অঞ্চলে অবস্থিত। কানাডা ও মেক্সিকোতেও প্রচুর পরিমাণে খনিজ তেল পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক গ্যাস : প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনে এ মহাদেশ বিশ্বে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করা হয়।

আকরিক লোহা : উত্তর আমেরিকা আকরিক লোহায় সমৃদ্ধ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে প্রচুর আকরিক লোহা উত্তোলন করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম আকরিক খনিগুলো ব্রুদ অঞ্চলে অবস্থিত।



চিত্র ৯.৪ : উত্তর আমেরিকার খনিজ সম্পদ

মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প : মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্পে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্পে পৃথিবী বিখ্যাত।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাহাজ নির্মাণে বিশ্বের অন্যতম দেশ। বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, ক্যামডেন প্রভৃতি শহরে জাহাজ নির্মাণ শিল্পগুলো অবস্থিত।

বিমানপোত ও রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিমানপোত ও রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পে বিশ্বে প্রসিদ্ধ। ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, ওহায়ো, ক্যালিফোর্নিয়া বিমানপোত এবং রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পে বিখ্যাত। কানাডাও এ সকল শিল্পে উন্নত।

কার্পাস বয়নশিল্প : কার্পাস বয়নশিল্পে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে বিখ্যাত। পেনসিলভানিয়া, নিউইয়র্ক, গ্রীনভিল, চার্লোট্ট এবং স্পার্টনবার্গ প্রসিদ্ধ কার্পাস শিল্প কেন্দ্র। কানাডার মন্ট্রিয়াল, ভ্যাঙ্কুভার, টরেন্টো, কুইবেক এবং মেঞ্জিকোর পুয়েভলা ও ভেরাক্রুজও বস্ত্র শিল্পে উন্নত।

কাগজ শিল্প : কাগজ শিল্পে কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রসিদ্ধ। অফুরন্ত কাঁচামাল প্রাপ্তির কারণে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও আলবার্টা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হুদ অঞ্চল এ শিল্পে উন্নত।

অন্যান্য শিল্প : এ মহাদেশ রবার, পশম, রেশম, তামাক, চিনি, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে।

প্রধান শহর ও বন্দর

ওয়াশিংটন ডি. সি : পটোম্যাক নদীর তীরে অবস্থিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ও সুন্দর শহর।

পিটসবার্গ : পেনসিলভানিয়ায় অবস্থিত পিটসবার্গ পৃথিবীর বৃহত্তম লোহা ও ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র।

নিউইয়র্ক : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র, সর্বপ্রধান নগর ও শ্রেষ্ঠ বন্দর। এখানে জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত।

বোস্টন : আটলান্টিক উপকূলে অবস্থিত বোস্টন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রসিদ্ধ শিল্প শহর। এর অদূরে কেমব্রিজে বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

শিকাগো : মিশিগান হ্রদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত শিকাগো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর এবং একটি প্রধান বন্দর, শিল্প কেন্দ্র ও রেলওয়ে জংশন। প্রায় ৩০টি রেলপথ এ শহরে এসে মিলিত হয়েছে।

লসএঞ্জেলস : প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শহর। হলিউড সিনেমা শিল্পে পৃথিবী বিখ্যাত।

সানফ্রান্সিসকো : প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বন্দর। এ বন্দর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর তীরে অবস্থিত প্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চলে।

অন্যান্য শহর ও বন্দর : উত্তর আমেরিকার অন্যান্য শহর ও বন্দরের মধ্যে ফিলাডেলফিয়া, অটোয়া, মন্ট্রিয়াল, টরেন্টো, হ্যালিফ্যাকস, উইনিপেগ, মেঞ্জিকো ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ নদীর উৎপত্তি হয়েছে—
 i মিশিগান হ্রদ ও অ্যাপালেশিয়ান উচ্চভূমি থেকে
 ii রকি পর্বতমালা ও সুপিরিয়র হ্রদ থেকে
 iii রকির বরফগলা পানি, বৃষ্টির পানি ও হ্রদ থেকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. iii
 খ. ii
 ঘ. i, ii ও iii

২. পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে উত্তর আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় ?

- ক. তুন্দ্রা ও নাতিশীতোষ্ণ
 গ. উপক্রান্তীয় ও সামুদ্রিক
 খ. ভূমধ্যসাগরীয় ও ক্রান্তীয়
 ঘ. নাতিশীতোষ্ণ ও ভূমধ্যসাগরীয়

নিচের সারণি পর্যবেক্ষণ করে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

খনিজ সম্পদ	উত্তোলনকারী দেশ	খনি অঞ্চল
খনিজ তেল	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো	?
আকরিক লোহা	?	হ্রদ

৩. জিজ্ঞাসা (?) চিহ্নিত কোন কোন অঞ্চলে তেলখনি অবস্থিত ?
 ক. টেক্সাস, লুইজিয়ানা, ক্যালিফোর্নিয়া
 গ. লুইজিয়ানা, ক্যালিফোর্নিয়া, আরিজোনা
 খ. টেক্সাস, নিউব্রান্সউইক, নোভাস্কটিয়া
 ঘ. নিউব্রান্সউইক, আরিজোনা, নোভাস্কশিয়া
৪. নিচের কোন দেশগুলো আকরিক লোহা উত্তোলন করে ?
 ক. আলাস্কা ও কানাডা
 গ. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কুইবেক
 খ. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা
 ঘ. মেক্সিকো ও আলাস্কা
৫. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত শিল্পসমূহ হল—
 ক. মোটরগাড়ি নির্মাণ ও কার্পাস বয়নশিল্প
 গ. কার্পাস বয়ন ও কাগজ শিল্প
 খ. জাহাজ নির্মাণ ও মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প
 ঘ. কাগজ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প
৬. উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী ?
 ক. সিয়েরা মান্দ্রে
 গ. ম্যাককিনলি
 খ. আলাস্কা রেঞ্জ
 ঘ. কোস্ট রেঞ্জ
৭. উত্তর আমেরিকার কোন জলবায়ু অঞ্চলে গড় তাপমাত্রা কম—
 ক. পার্বত্য জলবায়ু
 গ. আর্দ্র উপক্রান্তীয় জলবায়ু
 খ. ক্রান্তীয় জলবায়ু
 ঘ. পূর্ব-ক্রান্তীয় সামুদ্রিক জলবায়ু
৮. উত্তর আমেরিকার কোন দেশগুলো কাগজ শিল্পে প্রসিদ্ধ ?
 ক. কানাডা, মেক্সিকো, রাশিয়া
 গ. কানাডা, গ্রিনল্যান্ড
 খ. কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
 ঘ. কানাডা, আলাস্কা
৯. বছরে ২৫ ও ৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় যথাক্রমে—
 i শীতল নাতিশীতোষ্ণ পশ্চিম-ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল
 ii পূর্ব-ক্রান্তীয় শীতল সামুদ্রিক ও মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল
 iii পূর্ব-ক্রান্তীয় শীতল সামুদ্রিক ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল

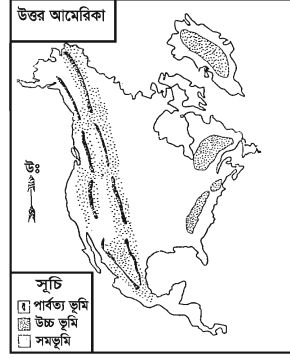
নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
গ. iii

- খ. ii
ঘ. i ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



উত্তর আমেরিকার ভূপ্রকৃতি

উপরিউক্ত মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- ক. প্রদত্ত মানচিত্রটি কোন মহাদেশের?
খ. উক্ত মহাদেশের মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চলের বর্ণনা দাও।
গ. উপরের মানচিত্রের প্রতিরূপ একটি মানচিত্র অঙ্কন করে ঐ মহাদেশের পর্বতমালা অঞ্চলটি চিহ্নিত কর।
ঘ. এই মহাদেশে ভারি শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. অনিকের মামা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। তিনি ঢাকায় বেড়াতে এলে অনিক জানতে চাইল—আমেরিকা কীভাবে পৃথিবীর প্রায় সকল দরিদ্র দেশে খাদ্য সাহায্য করে। মামা তাকে বললেন, ভৌগোলিক কারণে উত্তর আমেরিকার প্রায় সব দেশেই প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। তাছাড়া খনিজ সম্পদের দিক থেকেও মহাদেশটি সমৃদ্ধ হওয়ায় সেখানে অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে দেশগুলো প্রচুর আয় করে এবং দারিদ্র্যপীড়িত, রাষ্ট্রগুলোর প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

- ক. উত্তর আমেরিকা মহাদেশের কোন অংশকে পৃথিবীর বুটির বুড়ি বলা হয় ?
খ. কেন উত্তর আমেরিকাকে শ্রেষ্ঠ কৃষিপ্রধান মহাদেশ বলা হয়?
গ. অনিকের মামা উত্তর আমেরিকা মহাদেশের যে দেশটিতে থাকেন তা মহাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।
ঘ. খনিজ সম্পদ উত্তর আমেরিকাকে অন্যতম ধনী অঞ্চলে পরিণত করেছে—উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৩.



উত্তর আমেরিকার জলবায়ু অঞ্চলের মানচিত্র

উপরের মানচিত্রের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- ক. উপরের মানচিত্রটি কোন মহাদেশের?
খ. জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে এই মহাদেশের যে কোনো একটি অঞ্চলের বর্ণনা দাও।
গ. মানচিত্রটির প্রতিরূপ একটি মানচিত্র অঙ্কন করে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল চিহ্নিত কর।
ঘ. “কৃষিক্ষেত্রে এ মহাদেশের জলবায়ুর গুরুত্ব অপরিসীম”-উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

একাদশ অধ্যায়

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

দক্ষিণ আমেরিকা একটি ত্রিকোণাকার মহাদেশ। এর চারদিক সমুদ্রবেষ্টিত। মহাদেশটির শতকরা ৮৫ ভাগ অঞ্চল দক্ষিণ গোলার্ধের অন্তর্গত। এর দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে বহু ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের ফকল্যান্ড দ্বীপটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অবস্থান : উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ অবস্থিত। এর উত্তর ভাগ খুব প্রশস্ত, দক্ষিণ ভাগ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে হর্ন অন্তরীপে পরিণত হয়েছে। এ মহাদেশটি উত্তরে 13° উত্তর অক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে 56° দক্ষিণ অক্ষরেখা এবং পূর্বে 38° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা থেকে পশ্চিমে 82° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত।

এ মহাদেশের উত্তরে ক্যারিবিয়ান সাগর ও উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর ও পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত।

আয়তন : দক্ষিণ আমেরিকার আয়তন ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৫২ বর্গ কিলোমিটার (উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০০)।

ভূপ্রকৃতি : সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে তিনটি প্রধান ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

১। আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল

২। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মালভূমি

৩। সমভূমি অঞ্চল

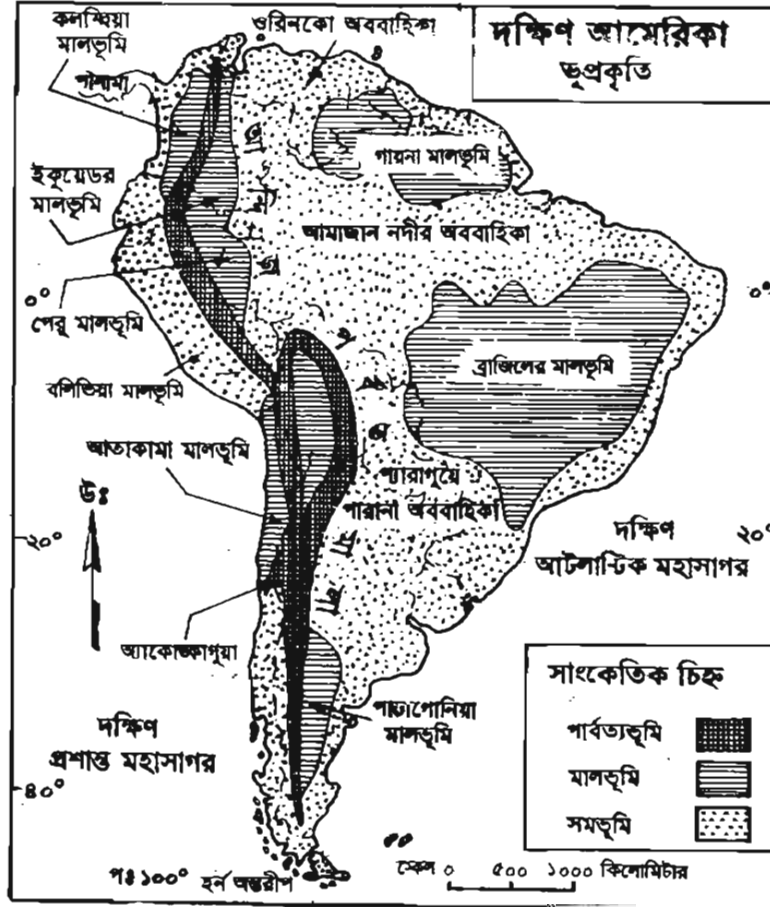
১। **আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল :** উত্তরে পানামা থেকে দক্ষিণে হর্ন অন্তরীপ পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার সমগ্র পশ্চিম উপকূল জুড়ে আন্দিজ পর্বতমালা অবস্থিত। এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণী (৬,৪০০ কিলোমিটার)। হিমালয়ের তুলনায় এর দৈর্ঘ্য প্রায় তিন গুণ। এ পর্বতের উত্তর ও দক্ষিণাংশের তুলনায় মধ্যভাগের বিস্তার সর্বাপেক্ষা অধিক এবং উচ্চতা বেশি। মধ্য চিলিতে অবস্থিত অ্যাকোজকাগুয়া (৬,৯৬০ মিটার) আন্দিজের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। অন্যান্য উচ্চ শৃঙ্গগুলো হল বলিভিয়াতে সোরাটা (৬,৫০২ মিটার) ও ইলিমনি (৬,৪৫৭ মিটার) এবং ইকুয়েডরের চিম্বোরাঙ্কো (৬,২৭২ মিটার) ও কোটোপ্যাক্সি (৫,৮৯৬ মিটার) আন্দিজে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে। কোটোপ্যাক্সি প্রকৃতপক্ষে একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। মহাদেশের উত্তরাংশে আন্দিজ পর্বতমালার বিভিন্ন শাখার মধ্যে কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু ও বলিভিয়ার মালভূমি অবস্থিত। এছাড়া মধ্য আন্দিজের পশ্চিমে উপকূলীয় সংকীর্ণ আতাকামা মালভূমি অবস্থিত।

হিমালয়ের ন্যায় আন্দিজ একটি নবীন ভূজিগ পর্বতমালা। এর গঠন কাজ এখনও চলছে। এজন্য এখানে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

২। **উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মালভূমি :** এ মালভূমি আমাজান নদীর অববাহিকার সমতল ভূমি দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। যেমন, উত্তরে গায়ানা মালভূমি এবং মহাদেশের পূর্ব দিকে ব্রাজিলের মালভূমি। এদের উচ্চতা প্রায় ৬০০ থেকে ১,৫০০ মিটারের মধ্যে। ব্রাজিলের মালভূমির পশ্চিমাংশে অপর একটি মালভূমি রয়েছে। এর নাম ম্যালোগ্রোসো (Mallogrosso) মালভূমি। ব্রাজিলের মালভূমি দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম মালভূমি। উপকূলের দিকে এর ঢাল অত্যন্ত খাড়া। কিন্তু পশ্চিমে এর ক্রমনিম্নে ঢাল সমভূমির সঙ্গে মিশে গেছে।

৩। **সমভূমি অঞ্চল :** বিভিন্ন নদীবিধৌত সমভূমি নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এর পশ্চিমে আন্দিজ পর্বতমালা এবং পূর্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মালভূমি অবস্থিত। এ অঞ্চলের সর্বউত্তরে রয়েছে ওরিনকো নদীর অববাহিকার সমভূমি। এখানকার তৃণভূমিকে ল্যানোস বলা হয়। আমাজান নদীর অববাহিকার সমভূমি সর্ববৃহৎ। এখানে সেলভা বনভূমি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণে রয়েছে পারানা-প্যরাগুয়ে ও উরুগুয়ে নদীর অববাহিকার সমভূমি। এ সমভূমির অপর নাম লা-প্লাটা সমভূমি। এ সমভূমির দক্ষিণে রয়েছে আর্জেন্টিনার পাম্পাস তৃণভূমি। মহাদেশের পশ্চিম উপকূল জুড়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত

একটি সংকীর্ণ সমভূমি রয়েছে। এর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর ও পূর্বে আন্দিজ পর্বতমালা। চিলির আতাকামা মরুভূমি এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।



চিত্র ১০.১ : দক্ষিণ আমেরিকার ভূপ্রকৃতি

নদী ও হ্রদ

দক্ষিণ আমেরিকার তিনটি প্রধান নদীর নাম আমাজান, ওরিনকো, এবং লা-প্লাটা বা প্রেট। এ তিনটি নদীই আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়েছে।

আমাজান : এর দৈর্ঘ্য ৬,২৭৫ কিলোমিটার। আমাজান নদী আন্দিজ পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে ব্রাজিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়েছে। দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর নদীগুলোর মধ্যে এর স্থান দ্বিতীয়। আমাজানের মতো এত পানি আর কোনো নদী দিয়ে সমুদ্রে পতিত হয় না। এর প্রবল স্রোতে মোহনা থেকে ৪৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত সমুদ্রের পানি ঘোলা থাকে। প্রবল স্রোতের জন্য এর মোহনায় বদ্বীপ গঠিত হয়নি। নিথ্রো, জাপুরা, রিওনিথ্রো, জুরুরা, পুরুজা, মাদিরা ও তাপাজোজ আমাজানের প্রধান উপনদী।

ওরিনকো : এর দৈর্ঘ্য ২,৪১৪ কিলোমিটার। এটি গায়ানা মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে গভীর অরণ্য ও ভেনেজুয়েলার ল্যানোস নামক তৃণভূমির মধ্য দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়েছে। আশুরা এবং সেতা এর উল্লেখযোগ্য উপনদী।

লা-প্লাটা : ব্রাজিলের পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন পারানা এবং 'ম্যালাগোসো মালভূমি' থেকে উৎপন্ন প্যারাগুয়ে নদী দক্ষিণে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে একত্রে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত স্রোত পারানা নামে পরিচিত। মোহনার নিকট এর সঙ্গে উরুগুয়ে নদীর মিলনে লা-প্লাটা নদীর সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এ তিনটি নদীর মোহনাই লা-প্লাটা নদী। এদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৭০০ কিলোমিটার।

হ্রদ : পেরু ও বলিভিয়ার সীমান্তবর্তী টিটিকাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,৮১২ মিটার উচ্চে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ এবং দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ হ্রদ। অপর উল্লেখযোগ্য হ্রদ হল বলিভিয়ার অন্তর্গত পুপো।

জলবায়ু

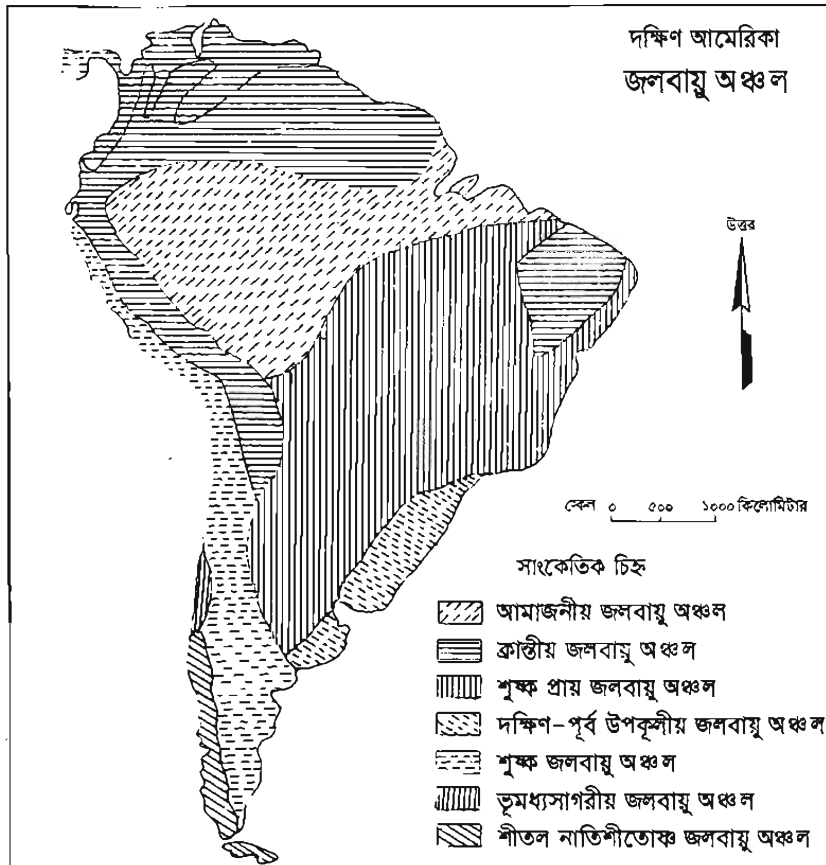
দক্ষিণ আমেরিকার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত। এ মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত। সুতরাং সমুদ্র উপকূল, পার্বত্যভূমি, মালভূমি ও গভীর অরণ্য ছাড়া এর সর্বত্রই উষ্ণতা অধিক। নিরক্ষীয় অঞ্চলের পার্বত্যভূমিতে উচ্চতার জন্য উষ্ণতা অনেক কম। ইকুয়েডরের রাজধানী কিটো শহরের উচ্চতা প্রায় ৩০০ মিটার। এজন্য বিষুবরেখার খুব নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও সেখানে তাপমাত্রা অধিক (প্রায় ১৩° সেলসিয়াস) নয়। তাই একে চিরবসন্তের শহর বলা হয়। ঋতুভেদে দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হল—

এ মহাদেশের উত্তরাংশ নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ায় সেখানে প্রায় প্রতি দিনই পরিচালন বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর ও পূর্বাংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আন্দিজ পর্বতমালায় পশ্চিমে কোনোরূপ বৃষ্টিপাত না হওয়ার ফলে আতাকামা মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রীষ্মকালে (জানুয়ারি মাসে) এ মহাদেশের দক্ষিণাংশের তাপমাত্রা প্রায় ১০° সেলসিয়াসের মতো থাকে এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে উত্তর-পূর্বাংশে ২৬° সেলসিয়াসের অধিক হয়। শীতকালে ‘জুলাই মাসে’ সূর্যের উত্তরায়ণের দরুন দক্ষিণে তাপমাত্রা কমে প্রায় ৪° সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায় এবং তা উত্তর দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬° সেলসিয়াসের অধিক হয়। তাই বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য খুবই কম।

জলবায়ু অঞ্চল : দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ুকে সাতটি প্রধান জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন,

১। আমাজনীয় জলবায়ু অঞ্চল : নিরক্ষীয় জলবায়ু বিশিষ্ট এ অঞ্চলে সারা বছর প্রচণ্ড উত্তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর ব্রাজিল, পূর্ব বলিভিয়া ও উত্তর আর্জেন্টিনা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারি) প্রায় ২৪° সেলসিয়াস এবং শীতকালীন (জুলাই) গড় তাপমাত্রা প্রায় ১৩° সেলসিয়াস।



চিত্র ১০.২ : দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ু অঞ্চল

২। **ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল** : এ জলবায়ু অঞ্চল উত্তরের অংশ ও দক্ষিণের অংশ নামে দুই ভাগে বিভক্ত। গায়ানা, ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার অধিকাংশ স্থান নিয়ে উত্তরের অংশ গঠিত। পর্বত ও নিম্নভূমি নিয়ে গঠিত হওয়ায় উত্তরাংশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে পার্থক্য দেখা যায়। দক্ষিণ অংশে পূর্ব ব্রাজিলের মালভূমি উষ্ণ ব্রাজিল স্রোতের প্রভাবে উষ্ণ থাকে ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অধিক তাপমাত্রা এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

৩। **শুষ্ক প্রায় জলবায়ু অঞ্চল** : পশ্চিম বলিভিয়া ও পশ্চিম আর্জেন্টিনা নিয়ে গঠিত এই জলবায়ু অঞ্চল দক্ষিণ আমেরিকার দুইটি অংশে দেখা যায়। উত্তর-পূর্বের শুষ্ক প্রায় ও মধ্য আন্দিজ শুষ্ক প্রায় অঞ্চল। উভয় অংশে গড় তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে প্রায় ২৭° সেলসিয়াস এবং শীতকালে প্রায় ২৩° সেলসিয়াস থাকে। গ্রীষ্মের শুষ্কতা চরমভাবে দেখা যায়।

৪। **দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় জলবায়ু অঞ্চল** : এখানে সব ঋতুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। গড় তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে প্রায় ২৪° সেলসিয়াস এবং শীতকালে প্রায় ১৬° সেলসিয়াস। দক্ষিণ ব্রাজিলের কিছু অংশ উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনার লা-প্লাটা অঞ্চল নিয়ে এ জলবায়ু অঞ্চল গঠিত।

৫। **শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চল** : আন্দিজ পর্বত বিশিষ্ট মহাদেশের পশ্চিমাংশে ও আর্জেন্টিনার অংশবিশেষে এ জলবায়ু বর্তমান। এখানে তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে স্থানভেদে ১৮° থেকে ২৪° সেলসিয়াস এবং শীতকালে স্থানভেদে ৪° থেকে ২৪° সেলসিয়াস হয়। উত্তর চিলি ও সমগ্র পেরু প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টিহীন; ফলে মরুপ্রায় অবস্থা দেখা যায়।

৬। **ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল** : সূর্যকে অনুসরণ করে ঋতুভেদে চাপ বলয়ের স্থান পরিবর্তনের ফলে চিলির মধ্যভাগে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় না এবং শীতকালে বৃষ্টি হয়। সারা বছর সূর্যকরোজ্জ্বল আবহাওয়া বর্তমান থাকে। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ১৫° সেলসিয়াস এবং শীতকালীন তাপমাত্রা ১০° সেলসিয়াস অনুভূত হয়।

৭। **শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল** : চিলির দক্ষিণ অংশে এ জলবায়ু বিরাজ করে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার এর অধিক। আন্দিজ পর্বতের পশ্চিম ঢালে বছরে ৫০৮ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়। স্থানবিশেষে তুষারপাত হয়। শীতকালে বেশি বৃষ্টিপাত হলেও সারা বছরই বৃষ্টি হয়।

অধিবাসী ও জনসংখ্যা

রেড ইন্ডিয়ানরা দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসী। স্পেনীয়গণ সর্বপ্রথম দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। স্পেনীয়দের পরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসিগণ দক্ষিণ আমেরিকায় আগমন করেন। এ সকল বিদেশি অধিবাসী কৃষিকাজের জন্য আফ্রিকার নিগ্রোদের নিয়োগ করেন। আদিম রেড ইন্ডিয়ান ও স্পেনীয়দের সংমিশ্রণে মেস্টিজো এবং নিগ্রো ও ইউরোপীয়দের সংমিশ্রণে উদ্ভূত জাতিকে মুলাত্রো বলে।

দক্ষিণ আমেরিকায় জনবসতি কম। এ মহাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩৫.৮০ কোটি। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ২০ জন (উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৩)। তবে মহাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিশেষত ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলে জনবসতির ঘনত্ব সর্বাধিক।

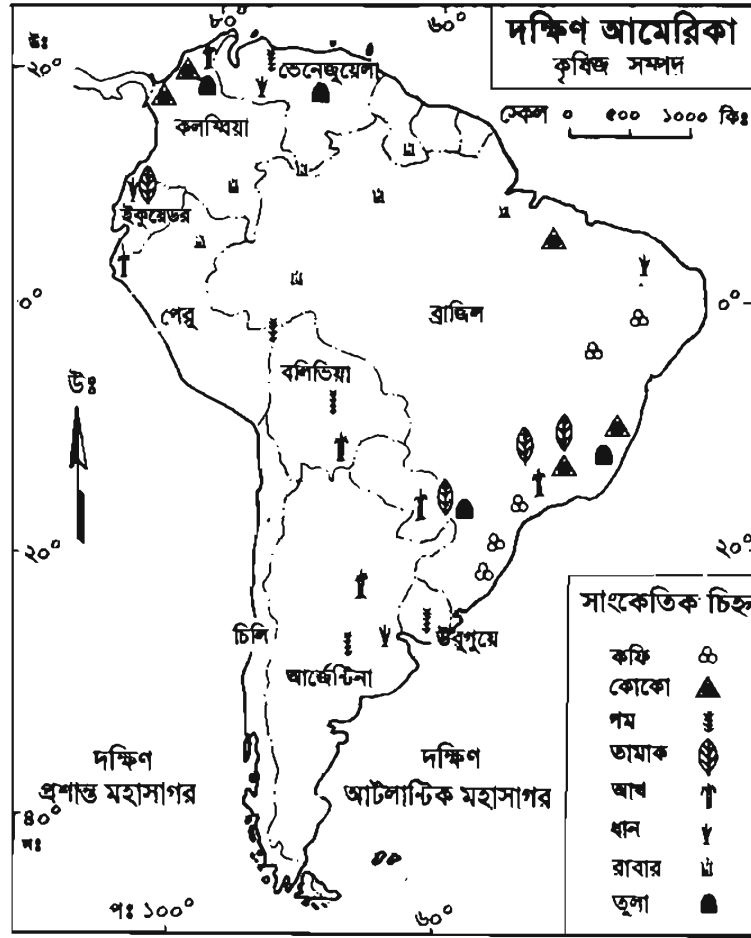
কৃষিজ সম্পদ

কৃষিকাজ দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কফি, কোকো, গম, তামাক, ভুট্টা, আখ, চা ও নানাবিধ ফল দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। নিম্নে কৃষিজ দ্রব্যের বিবরণ দেওয়া হল—

কফি : কফি উৎপাদনে দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয়। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক কফি এ মহাদেশে উৎপন্ন হয়। কফি উৎপাদন ও রপ্তানিতে ব্রাজিল ও কলম্বিয়া উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর ও পেরুতে যথেষ্ট কফি উৎপন্ন হয়।

কোকো : ব্রাজিল, ইকুয়েডর ও ভেনেজুয়েলাতে প্রধানত কোকোর চাষ হয়। কোকো উৎপাদনে ব্রাজিল বিশ্বে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে।

গম : দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা গমচাষে প্রসিদ্ধ। এছাড়া ব্রাজিলের দক্ষিণাংশে, উরুগুয়ের পাম্পাস অঞ্চলে ও চিলির ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গমের চাষ হয়।



চিত্র ১০.৩ : দক্ষিণ আমেরিকার কৃষিজ সম্পদ

তামাক : ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনায় তামাক উৎপন্ন হয়। তামাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে ব্রাজিল বিশ্বে প্রসিদ্ধ।

ভুট্টা : ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনায় প্রচুর ভুট্টার চাষ হয়।

আখ : বিশ্বের অধিকাংশ আখ এ মহাদেশে উৎপন্ন হয়। ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা আখ চাষে প্রসিদ্ধ।

চা : এ মহাদেশের পার্বত্যভূমির ঢালে প্রচুর চা জন্মে। তবে এর অধিকাংশ চা একমাত্র আর্জেন্টিনাতেই উৎপন্ন হয়।

অন্যান্য : এ মহাদেশের সংকীর্ণ বৃষ্টিবহুল উপকূলীয় অঞ্চল ও নদী উপত্যকায় ধান এবং উত্তর-পূর্ব ব্রাজিল ও পেরুতে উৎকৃষ্ট জাতের তুলা চাষ হয়।

এ মহাদেশের উৎপন্ন ফলের মধ্যে কলা, আনারস, কমলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বনজ সম্পদ

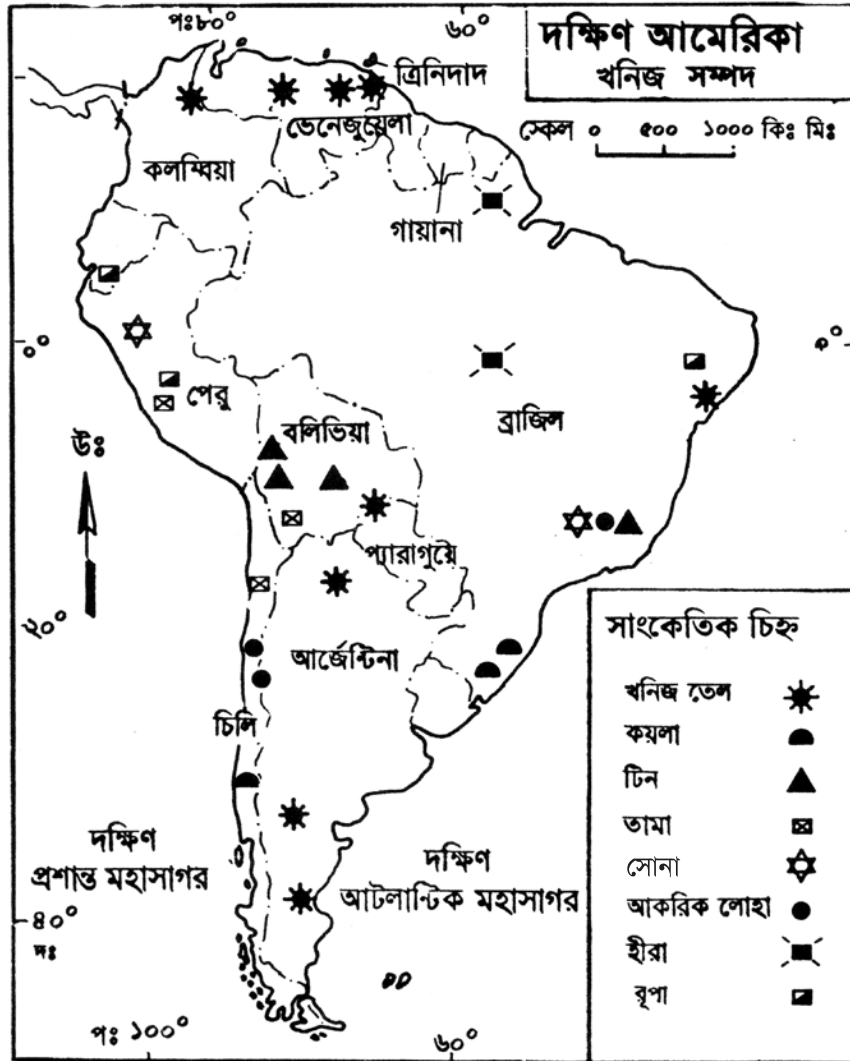
দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা ও গায়ানায় অতিশয় নিবিড় ও বিশাল বনভূমি আছে। এ বনভূমির স্থানীয় নাম সেলভা। এতে মেহগনি, রোজউড, আবলুস, লগউড প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। ব্রাজিলের রবার, কফি ও পেরুর সিনকোনা বৃক্ষ বিশ্ববিখ্যাত। ওরিনকো নদীর অববাহিকায় ল্যানোস নামক তৃণভূমি আছে। ব্রাজিলের মালভূমির পশ্চিম অঞ্চলে ক্যাম্পোস ও পাম্পাস তৃণভূমি অবস্থিত। আর্জেন্টিনার তৃণভূমি পাম্পাস নামে পরিচিত। কাঁটাময় ঝোপ ও গুল্ম আতাকামা মরুভূমির উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। চিলির মধ্যভাগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কমলালেবু ও অন্যান্য ফলের গাছ জন্মে। চিলির দক্ষিণাংশে পাইন, ফার প্রভৃতি ঘন বন দেখা যায়।

জীবজন্তু

দক্ষিণ আমেরিকার বনাঞ্চল ও তৃণভূমিতে অদ্ভুত রকমের জীবজন্তু দেখতে পাওয়া যায়। দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট বানর, গোলাকার মস্তক ও তিন আঙুল বিশিষ্ট তৃণভোজী শ্লথ, ক্যাজারুর ন্যায় উদরে সন্তান রাখার মতো থলিবিশিষ্ট অপোসাম, বোয়া নামক বৃহদাকার সাপ ও বাঘের ন্যায় হিংস্রপ্রাণী জাগুয়ার আছে। এরা সকলেই বৃক্ষচারী। লামা, ভাইকুন, আলপাকা প্রভৃতি ভারবাহী প্রাণী। এদের লোম থেকে শীতবস্ত্র তৈরি হয়। কগুর নামক শকুনজাতীয় বৃহৎ পাখি দেখা যায়। তৃণভূমিতে ঘোড়া, উট ও রিয়া নামক এক ধরনের বড় পাখি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া দন্তহীন পিপীলিকা-ভুক, আর্মাডিলো, শূয়ের জাতীয় টেপির ও পেকারি এবং রক্তশোষক বাদুড় প্রভৃতি অদ্ভুত জন্তুও দেখা যায়। এ মহাদেশের গৃহপালিত পশুর মধ্যে ঘোড়া, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রধান। এখান থেকে প্রচুর পশম, মাংস, মাখন, পনির ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি হয়।

খনিজ সম্পদ

দক্ষিণ আমেরিকায় কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস বেশি নেই কিন্তু অন্যান্য খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। নিম্নে খনিজ সম্পদের বিবরণ দেওয়া হল—



চিত্র ১০.৪: দক্ষিণ আমেরিকার খনিজ সম্পদ

খনিজ তেল : দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, পেরু, ব্রাজিল ও ত্রিনিদাদ দ্বীপে প্রচুর খনিজ তেল পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ভেনেজুয়েলা খনিজ তেল উত্তোলন ও রপ্তানিতে বিশ্বে প্রসিদ্ধ।

প্রাকৃতিক গ্যাস : ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও ত্রিনিদাদ দ্বীপে গ্যাস পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ভেনেজুয়েলার উৎপাদন সবচেয়ে বেশি।

কয়লা : এ মহাদেশে কয়লা সম্পদ নেই বললেই চলে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলা, চিলি ও পেরুতে সামান্য পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায়।

টিন : ব্রাজিল, বলিভিয়া ও আর্জেন্টিনাতে প্রচুর টিন পাওয়া যায়। টিন উৎপাদনে ব্রাজিল ও বলিভিয়া বিশ্ববিখ্যাত।

তামা : চিলি ও পেরুতে তামা পাওয়া যায়। তামা উৎপাদনে চিলি বিশ্বে প্রসিদ্ধ।

সোনা : কলম্বিয়া, চিলি, ব্রাজিল ও গায়ানায় সোনার খনি আছে। তবে উৎপাদন অতি নগণ্য।

আকরিক লোহা : ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, চিলি ও পেরুতে আকরিক লোহা পাওয়া যায়। আকরিক লোহা উৎপাদনে ব্রাজিল বিশ্বে উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য : ব্রাজিল ও গায়ানায় হীরা, কলম্বিয়ায় প্লাটিনাম ও পান্না পাওয়া যায়।

শিল্প

দক্ষিণ আমেরিকা শিল্পে বিশেষ উন্নত নয়। তবে এ মহাদেশের কোনো কোনো দেশ কতিপয় শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে।

শিল্প গড়ে ওঠার কারণ : কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদের প্রাপ্যতা, মূলধনের সহজলভ্যতা, অনুকূল জলবায়ু, উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির প্রভাবে দক্ষিণ আমেরিকায় কতিপয় শিল্প গড়ে উঠেছে। নিম্নে এদের বিবরণ দেওয়া হল—

লোহা ও ইস্পাত শিল্প : এ মহাদেশের ব্রাজিল লোহা ও ইস্পাত শিল্পে খুবই উন্নত। ব্রাজিলের ভোল্টা রেডোন্ডা, মনলিভাডা, বেলা হরিজোন্টে লোহা ও ইস্পাতের বড় বড় কারখানা রয়েছে। এছাড়া চিলির ভালডিভিয়া ও টালকাহুয়ানো, পেরুর সিমবোট, কলম্বিয়ার বোগোতা প্রভৃতি স্থানেও এ শিল্প গড়ে উঠেছে।

কার্পাস বয়নশিল্প : ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলায় সুতা ও কাপড়ের কল রয়েছে। এদের মধ্যে ব্রাজিলের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি।

চিনি : চিনি উৎপাদন ও রপ্তানিতে ব্রাজিল বিশ্বে প্রসিদ্ধ।

অন্যান্য : পশম, সিমেন্ট, জাহাজ নির্মাণ, কৃত্রিম রবার, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পে ব্রাজিল উন্নত। চিলি ও আর্জেন্টিনায় পশম শিল্প গড়ে উঠেছে। খাদ্যদ্রব্য ও নানা প্রকার নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য এ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের কলকারখানা গড়ে উঠেছে।

মৎস্য সম্পদ

দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এখানকার অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তীর্ণ, আবার সমুদ্র উপকূলেও মাছ ধরা যায়। চিলি, পেরু, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের উপকূল থেকে মহাদেশের অধিকাংশ মাছ পাওয়া যায়। তবে মাছ ধরা ও রপ্তানিতে পেরু ও চিলি বিশ্বে প্রসিদ্ধ। ধৃত মাছের মধ্যে টুনা, হেরিং, হেক, পিলচার্ড, একোবেট প্রভৃতি প্রধান।

প্রধান শহর ও বন্দর

সাও পাওলো : ব্রাজিলের পূর্ব অংশে আটলান্টিক উপকূলে অবস্থিত। এটি একটি বৃহৎ শহর ও প্রসিদ্ধ বন্দর।

বুয়েন্স আয়ারস : লা-প্লাটা নদীর মোহনায় অবস্থিত, আর্জেন্টিনার রাজধানী এবং দক্ষিণ আমেরিকার প্রসিদ্ধ শহর ও বন্দর।

বোগোতা : প্রায় ২,৬৫২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত কলম্বিয়ার রাজধানী ও প্রধান শিল্পশহর।

গুইয়াকিল : ইকুয়েডরের প্রধান শহর, বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও সমুদ্রবন্দর। এখান থেকে কোকো ও টুপি রপ্তানি হয়।

সুফ্রে : বলিভিয়ার রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক রাজধানী। এটি খনিজ সম্পদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

লাপাজ : ৩,৬৩২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত বলিভিয়ার রাজধানী ও প্রধান শহর। এটি পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানী।

সান্টিয়াগো : প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে ৮০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে আন্দিজ পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত চিলির রাজধানী এবং প্রধান শিল্প ও বাণিজ্যিকেন্দ্র।

রিও-ডি-জেনিরো : ব্রাজিলের সাবেক রাজধানী, প্রধান শিল্প নগর ও বন্দর এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের প্রাণকেন্দ্র।

মন্টিভিডিও : লা-প্লাটা নদীর মোহনায় অবস্থিত উরুগুয়ের রাজধানী, প্রধান শহর ও বন্দর। সমগ্র দেশের প্রায় অর্ধেক লোক এ শহরে বাস করে।

লিমা : পেরুর রাজধানী এবং প্রধান শহর।

কারাকাস : ক্যারিবিয়ান সাগরের উপকূল থেকে ১৭-৭০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে ভেনেজুয়েলার রাজধানী।

ম্যারাকাইবো : ভেনেজুয়েলা সাগরের তীরে অবস্থিত ভেনেজুয়েলার অন্যতম শহর ও বন্দর।

জর্জটাউন : গায়ানার রাজধানী ও প্রধান বন্দর। এ শহরের অধিবাসীদের অধিকাংশই ভারতীয় এবং নিগ্রো বংশোদ্ভূত।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মালভূমি কোন অববাহিকার সমতল ভূমি দ্বারা বিভক্ত ?
 ক. ওরিনকো নদীর অববাহিকা
 খ. আমাজন নদীর অববাহিকা
 গ. লা-প্লাটা নদীর অববাহিকা
 ঘ. পারানা ও প্যারাগুয়ে নদীর অববাহিকা
২. দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ায় সেখানে সংঘটিত হয়—
 ক. ঘূর্ণিঝড় বৃষ্টি
 খ. সংঘর্ষ বৃষ্টি
 গ. পরিচালন বৃষ্টি
 ঘ. শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি
৩. দক্ষিণ আমেরিকার আয়তন কম হলেও জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার পেছনে কোন কারণটি অধিক যুক্তিযুক্ত ?
 i সমভাবাপন্ন জলবায়ু
 ii ত্রিকোণাকার আকৃতি
 iii অধিকাংশ এলাকা সমভূমি

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তাপস জানুয়ারি মাসে জামুরি স্কাউট সম্মেলনে বাংলাদেশের ছাত্র প্রতিনিধি হয়ে ব্রাজিলে এসেছে। জানুয়ারি মাস হলেও তাপস এখানে দেশের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা অনুভব করছে। অথচ ব্রাজিল নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত।
 - ক. কোন কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে ব্রাজিল বিশেষ প্রসিদ্ধ?
 - খ. জানুয়ারি মাস হলেও ব্রাজিলের আবহাওয়া বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার মতো কেন?
 - গ. দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে ব্রাজিল যে জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সেই জলবায়ু অঞ্চল চিহ্নিত কর।
 - ঘ. নিরক্ষীয় রেখা অতিক্রম করার কারণেই দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের জলবায়ু বাংলাদেশের জলবায়ু অপেক্ষা ভিন্নতর, মূল্যায়ন কর।
২. দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ পশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এ মহাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে পশম, মাখন ও পনির বিদেশে রপ্তানি হয়। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের রপ্তানি-বাণিজ্য সমৃদ্ধশালী হওয়ার ক্ষেত্রে এ মহাদেশের ভূপ্রকৃতি প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। এ মহাদেশে ল্যানোস, ক্যাম্পাস ও পাম্পাস নামক তৃণভূমি রয়েছে যা পশুচারণের জন্য উপযোগী।
 - ক. দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে কয়টি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে?
 - খ. ‘পাম্পাস’ তৃণভূমি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের কোন ভূপ্রাকৃতিক বিভাগের অন্তর্গত তা বর্ণনা কর।
 - গ. মানচিত্র অঙ্কন করে ল্যানোস, ক্যাম্পাস ও পাম্পাস তৃণভূমি চিহ্নিত কর।
 - ঘ. বিস্তৃত পশুচারণ ক্ষেত্রগুলো এ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

দ্বাদশ অধ্যায় বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নত নয়। ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত দেশে যেসব শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পগুলোর মধ্যে পাট, বস্ত্র, চিনি, কাগজ, সার, সিমেন্ট ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাট শিল্প

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বর্তমানে পাট শিল্পই প্রধান। কাঁচামালের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে কোনো পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সর্বপ্রথম পৃথিবীর বৃহত্তম আদমজি পাটকলটি ১৯৫১ সালে স্থাপিত হয়। ২০০৬-২০০৭ সালের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ৭৬টি পাটকল রয়েছে (উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক, ২০০৭/এপ্রিল/২০০৮, পৃষ্ঠা-২২৯)। বর্তমানে আদমজি পাট কলটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

গড়ে ওঠার কারণ : কাঁচামালের প্রাচুর্য, আর্দ্র জলবায়ু, শক্তি সম্পদ ও মূলধনের প্রাপ্যতা, সুলভ শ্রমিক সরবরাহ, উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশ্ববাজারে পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে পাটকল গড়ে উঠেছে।

উৎপাদন : ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশে প্রায় ২.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণি ২৭)। ২০০৬-২০০৭ সালে বাংলাদেশে প্রায় ২.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৮, সারণি-৩৩) এ সকল পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে চট, বস্তা, কার্পেট, কার্পেট ব্যাকিং, দড়ি, গালিচা, ইত্যাদি প্রধান।

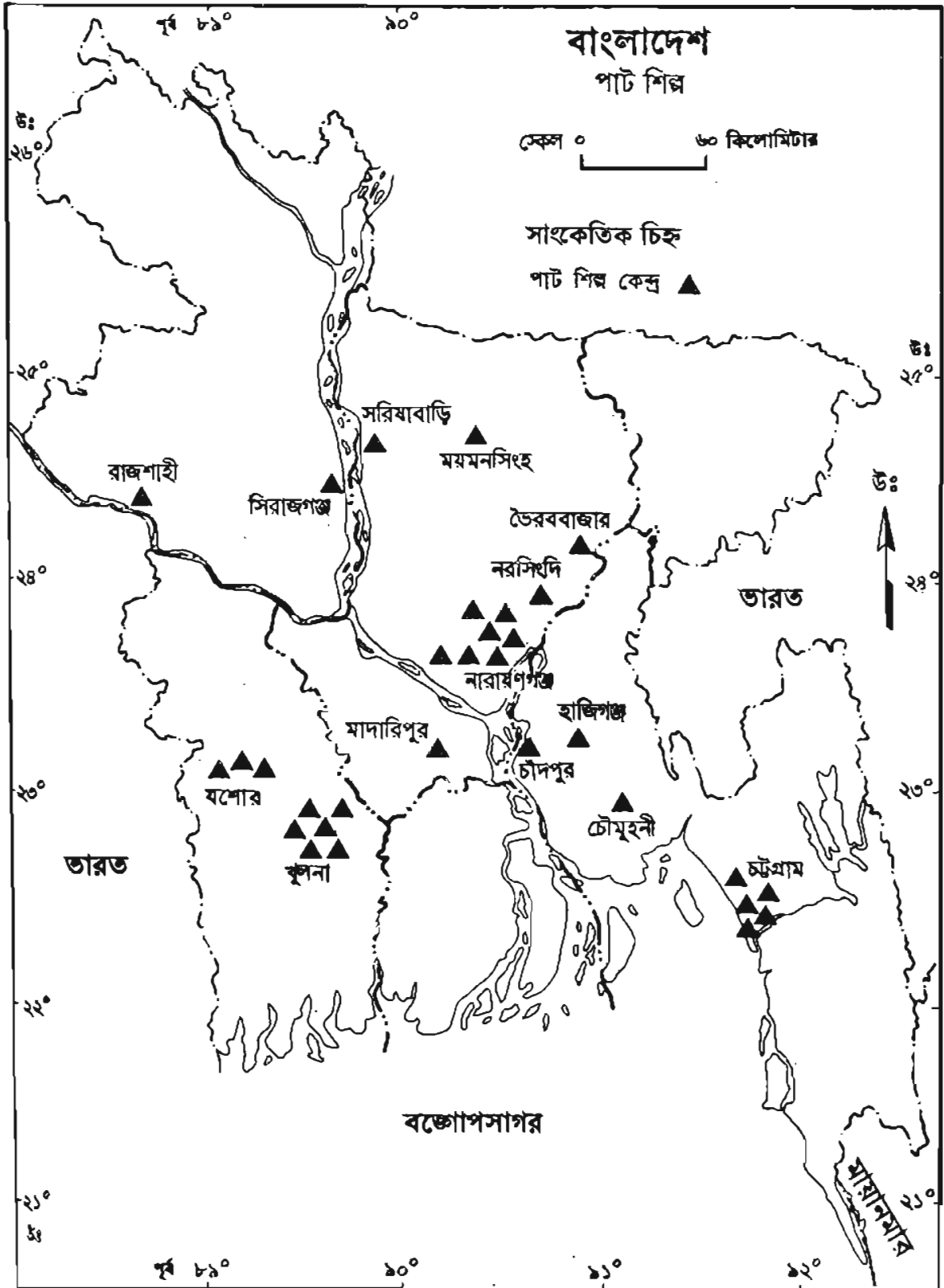
পাট শিল্পের কেন্দ্রসমূহ : বাংলাদেশে পাট শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলো হল নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও ঢাকা। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য অংশেও বিক্ষিপ্তভাবে কতকগুলো পাটকল গড়ে উঠেছে। পাট শিল্পকে নিম্নোক্ত ৪টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

১। ঢাকা অঞ্চল : ঢাকা বিভাগের পাটকলগুলো এ অঞ্চলের অন্তর্গত। দেশের অধিকাংশ পাটকল ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত। এদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, কাঞ্চন, নরসিংদি, ঘোড়াশাল, পলাশ, ডেমরা, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, সরিষাবাড়ি ও মাদারিপুরে পাটকল অবস্থিত।

২। চট্টগ্রাম অঞ্চল : এ বিভাগের পাটকলগুলো চট্টগ্রাম শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত। এ ছাড়া চৌমুহনী, চাঁদপুর ও হাজিগঞ্জও পাটকল স্থাপিত হয়েছে।

৩। খুলনা অঞ্চল : এ অঞ্চলের বেশিরভাগ পাটকল খুলনায় অবস্থিত। অন্যান্য পাটকলগুলো যশোর জেলায় গড়ে উঠেছে।

৪। রাজশাহী অঞ্চল : শক্তি সম্পদ ও সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবহেতু এ অঞ্চল পাট শিল্পে খুবই অনগ্রসর। এ অঞ্চলের ২টি পাটকলের ১টি রাজশাহীতে এবং অপরটি সিরাজগঞ্জে অবস্থিত।



চিত্র ১১.১: বাংলাদেশের পাট শিল

বাণিজ্য : পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশ ২৪.৪ কোটি ইউএস ডলার অর্জন করে (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণি ৪২)। ২০০৭-২০০৮ সালে বাংলাদেশ পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ২৪.৩ কোটি ইউএস ডলার অর্জন করে। (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮ সারণি-৪৯)।

বস্ত্র শিল্প

বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের খাদ্যের পরই বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাই এ শিল্পের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৯টি বস্ত্রকল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে বস্ত্রকলের সংখ্যা ৬৩টি (১৯৯৭-৯৮)।

উৎপাদন : বাংলাদেশে সাধারণত মোটা, মাঝারি ও সূক্ষ্ম এ তিন ধরনের কাপড় তৈরি হয়। তবে কিছু কিছু সূক্ষ্ম ধরনের কাপড়ও তৈরি হয়।

গড়ে ওঠার কারণ : সুলভ জলপথে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা, মূলধনের প্রাপ্যতা, দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক, উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্থানীয় ব্যাপক বাজার ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে।

বস্ত্র শিল্পের বণ্টন : দেশের অধিকাংশ বস্ত্রকলগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় অবস্থিত। তবে বিক্ষিপ্তভাবে দেশের অন্যান্য স্থানেও বস্ত্রকল গড়ে উঠেছে। আলোচনার সুবিধার্থে বস্ত্র শিল্পকে কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

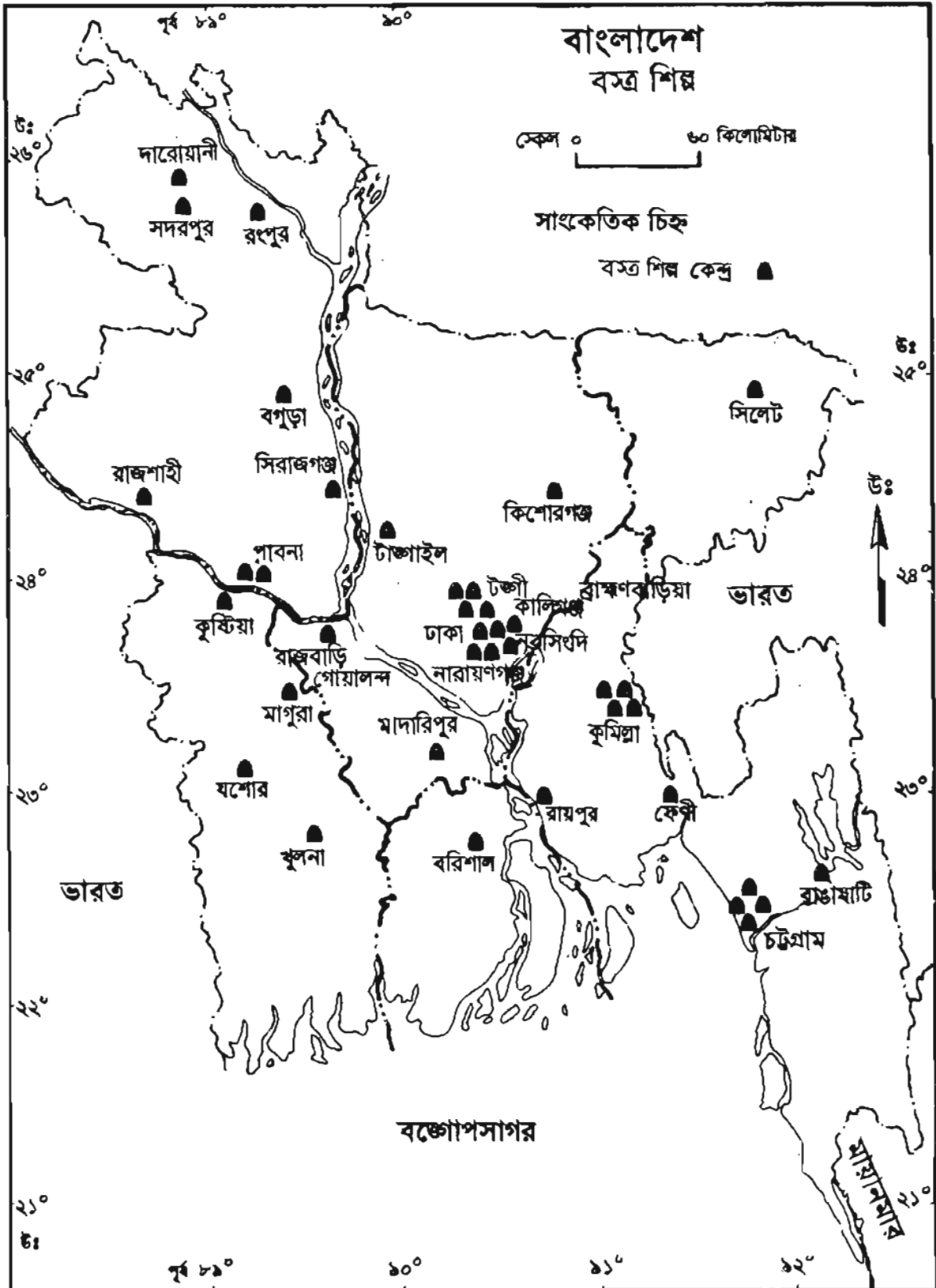
১। ঢাকা অঞ্চল : ঢাকা বাংলাদেশের প্রধান বস্ত্র বয়নশিল্পের কেন্দ্র। এ এলাকায় ২৪টি বস্ত্রকল গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের নারায়ণগঞ্জে ৫টি, টঙ্গীতে ৮টি এবং অবশিষ্ট কলগুলো নরসিংদি, ডেমরা, কাঁচপুর, কালিগঞ্জ, মুড়াপাড়া, ফতুল্লা, পোস্টগোলা, সাভার প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত।

২। চট্টগ্রাম অঞ্চল : চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান বস্ত্র বয়নশিল্পের কেন্দ্র। এখানে ৯টি বস্ত্র ও সুতার কল রয়েছে। এ কলগুলো ফৌজদারহাট, হালিশহর, ষোলশহর, কালুরঘাট প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত।

৩। কুমিল্লা ও নোয়াখালি অঞ্চল : এ অঞ্চলে বস্ত্র ও সুতার কলের সংখ্যা ৮টি। এগুলোর মধ্যে কুমিল্লা জেলায় ৪টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২টি, ফেনীতে ১টি এবং রায়পুরে ১টি বস্ত্রকল রয়েছে।

৪। অন্যান্য অঞ্চল : এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ২২টি বস্ত্রকল গড়ে উঠেছে। বস্ত্র কলগুলো পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, মাদারিপুর, গোয়ালন্দ, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত।

বাণিজ্য : বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই বাংলাদেশকে প্রতিবছর বিশ্ববাজার থেকে কয়েকশ কোটি টাকা মূল্যের সুতা ও বস্ত্র আমদানি করতে হয়।



চিত্র ১১.২ : বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্প

চিনি শিল্প

চিনি শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিল্প। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে ৩৯ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি চিনিকল ছিল। বর্তমানে দেশে ১৭টি চিনির কল রয়েছে। আখের অভাবে কলগুলোতে ক্ষমতা অনুযায়ী চিনি উৎপাদন হয় না। বিদেশি মূলধনে প্রতিষ্ঠিত দর্শনার কেবু অ্যান্ড কোম্পানি চিনির কলটি বাদে বাকি ১৬টি রাষ্ট্রীয়ত্ব।

গড়ে ওঠার কারণ : কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য, মূলধনের প্রাপ্যতা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপক বাজার, সুলভ শ্রমিক সরবরাহ, সরকারি উদ্যোগ ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে দ্রুত চিনি শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

উৎপাদন : ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশের চিনির কলগুলোতে প্রায় ২.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি উৎপন্ন হয় (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণি ২৭)। ২০০৭-২০০৮ সালে বাংলাদেশের চিনি কলগুলোতে প্রায় ১.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি উৎপন্ন হয় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৮, সারণি-৩৩)।

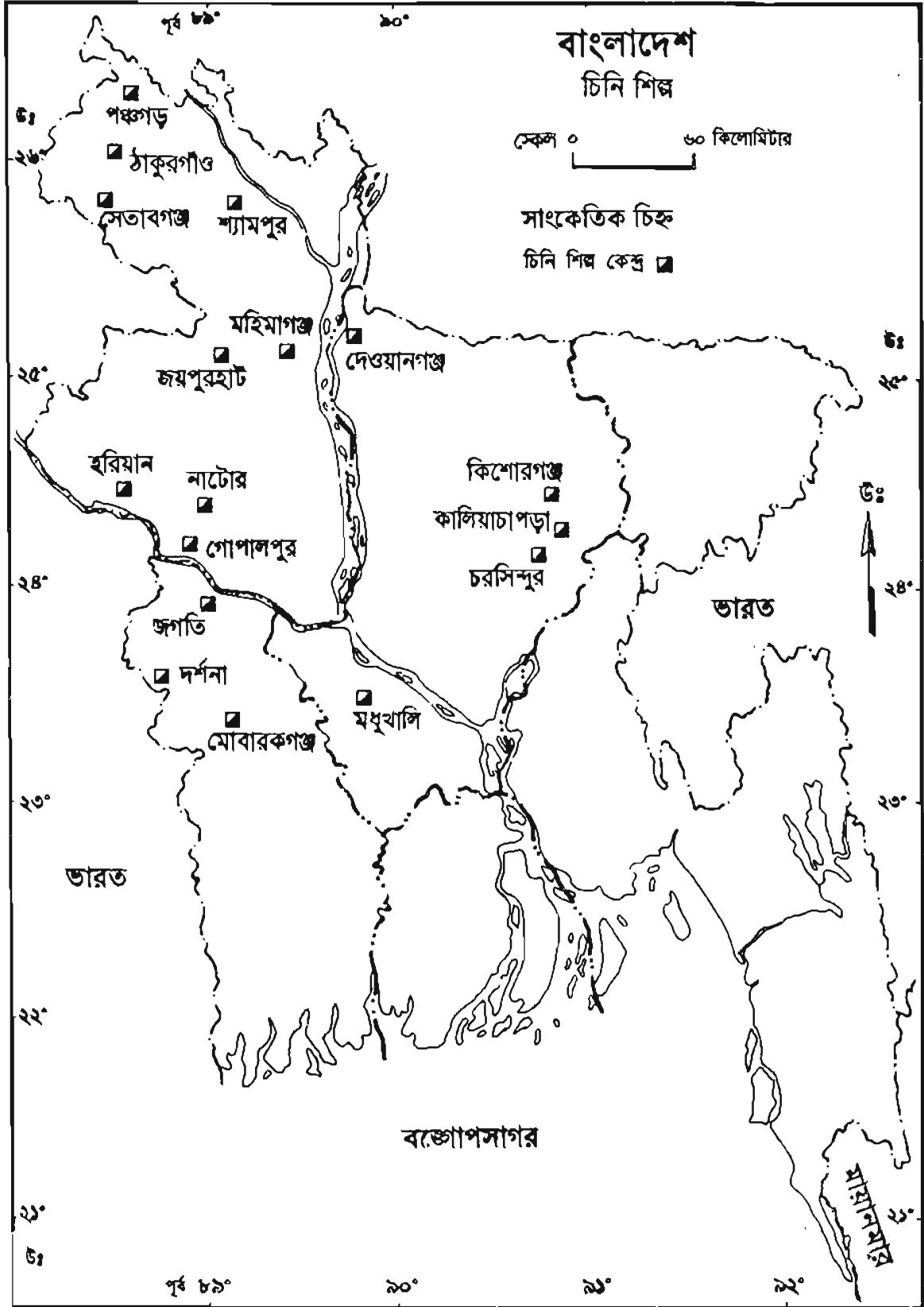
চিনি শিল্পের বণ্টন : বাংলাদেশের চিনির কলগুলো রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকা বিভাগে গড়ে উঠেছে। নিম্নে বিভাগ অনুসারে চিনি শিল্পের বণ্টন দেওয়া হল-

১। **রাজশাহী বিভাগ :** দেশের ১৭টি চিনিকলের মধ্যে ৯টি চিনির কল এ বিভাগে গড়ে উঠেছে। কারণ দেশের মোট উৎপাদিত আখের প্রায় অর্ধেক এ বিভাগেই জন্মে। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও মৃত্তিকায় আখের ফলন ভালো হয় বলেই দ্রুত এ শিল্পের প্রসার ঘটেছে। এ অঞ্চলের চিনির কলগুলো ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, শ্যামপুর, সেতাবগঞ্জ, মহিমাগঞ্জ, জয়পুরহাট, হরিয়ান, নাটোর, গোপালপুর ও পাবনায় অবস্থিত।

২। **ঢাকা বিভাগ :** চিনি শিল্পে এ বিভাগ দ্বিতীয়। ৫টি চিনির কল গড়ে উঠেছে। এ কলগুলো দেওয়ানগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, কালিয়াচাপড়া, চরসিন্দুর ও মধুখালিতে অবস্থিত।

৩। **খুলনা বিভাগ :** কাঁচামালের অভাবহেতু চিনি শিল্পে এ বিভাগ তৃতীয়। এ বিভাগে মাত্র ৩টি চিনির কল গড়ে উঠেছে। কলগুলো জগতি, দর্শনা ও মোবারকগঞ্জে অবস্থিত।

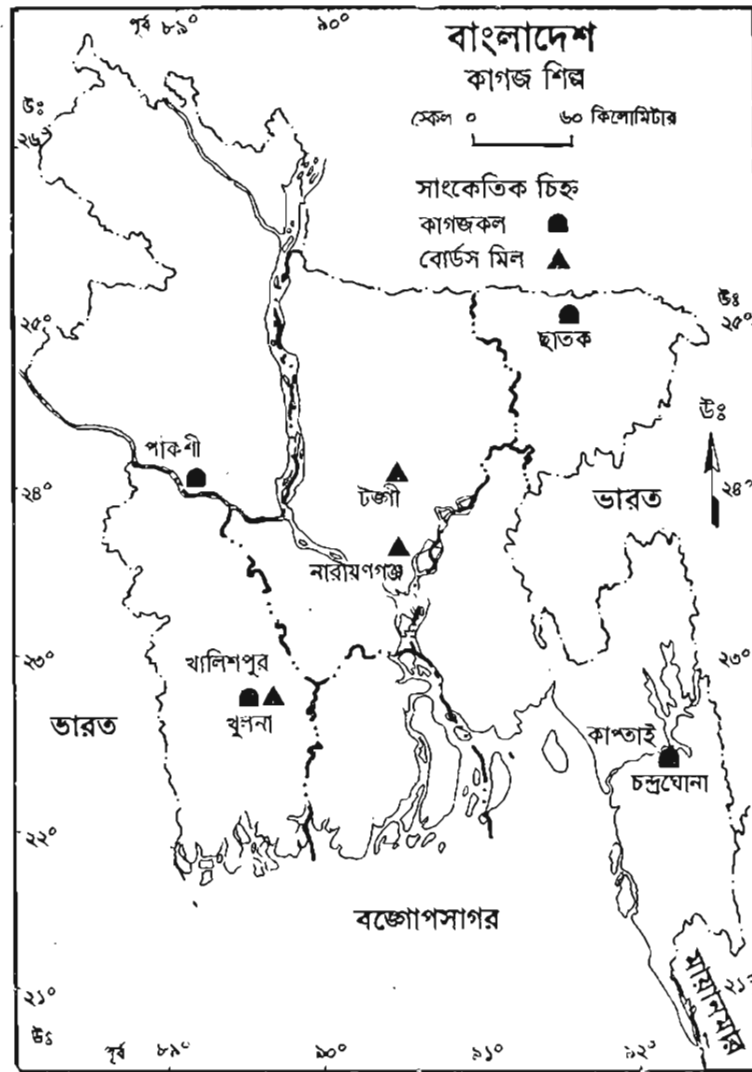
বাণিজ্য : প্রয়োজনের তুলনায় চিনির উৎপাদন কম বলে বাংলাদেশকে বিশ্ববাজার থেকে চিনি আমদানি করতে হয়।



চিত্র ১১.৩ : বাংলাদেশ চিনি শিল্প

কাগজ শিল্প

কাগজ শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিল্প। ১৯৫৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে কোনো কাগজের কল ছিল না। ফলে কাগজ আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হত। বাংলাদেশে ৭টি কাগজকলসহ মোট ১১টি কাগজ ও বোর্ড কারখানা রয়েছে।



চিত্র ১১.৪: বাংলাদেশের কাগজ শিল্প

গড়ে ওঠার কারণ : বাঁশ, বেত, আখের ছোবড়া, নলখাগড়া, প্রভৃতি কাঁচামালের প্রাচুর্য ও শক্তি সম্পদের প্রাপ্যতা, সরকারি উদ্যোগ, স্থানীয় ব্যাপক বাজার, সুশ্রুত শ্রমিক, উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে দ্রুত কাগজকল গড়ে উঠেছে।

উৎপাদন : ১৯৯৭-৯৮ সালে বাংলাদেশে ৩৮,২০৮ মেট্রিক টন কাগজ এবং ৭,৬৭৩ মেট্রিক টন নিউজপ্রিন্ট উৎপন্ন হয়। (উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯৮, সারণি ৫.১৩)। ২০০২-২০০৩ সালে বাংলাদেশে ৩০,২১২ মেট্রিক টন কাগজ উৎপন্ন হয়। উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০০৬-সারণি ৫.১৩)। এ ছাড়া হার্ডবোর্ড ও পার্টিকেল বোর্ড উৎপন্ন হয়।

নিম্নে বাংলাদেশের কাগজকলগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল—

১। **কর্ণফুলী কাগজকল** : এটি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও বৃহত্তম কাগজকল। ১৯৫৩ সালে রাঙামাটি জেলার চন্দ্রঘোনা নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীর তীরে এ কলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অফুরন্ত বাঁশ ও নরম কাঠ কাঁচামাল হিসেবে এবং কাস্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রধানত লেখার, ছাপার, মোড়কের কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

২। **খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানা** : ১৯৫৯ সালে খুলনা শহরের অদূরে ভৈরব নদীর তীরে খালিশপুর নামক স্থানে এ কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাগজকল। নিকটবর্তী সুন্দরবনের পর্যাপ্ত গোয়া কাঠ কাঁচামাল হিসেবে এবং গোয়ালপাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ শক্তি হিসেবে এ কারখানায় ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এর উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬৮ হাজার টন।

৩। **উত্তরবঙ্গ কাগজকল** : এটি দেশের তৃতীয় বৃহত্তম কাগজকল। ১৯৬৯ সালে পাবনার পাকশী নামক স্থানে পদ্মা নদীর তীরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের চিনির কলগুলো থেকে প্রাপ্ত আখের ছোবড়া কাঁচামাল হিসেবে এবং ভেড়ামারার বিদ্যুৎ শক্তি হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়। এ কারখানায় উন্নতমানের লেখার কাগজ উৎপন্ন হয়।

৪। **সিলেট মন্ড ও কাগজকল** : ছাতকের সুরমা নদীর তীরে এ কারখানাটি অবস্থিত। স্থানীয় হাওর এলাকার নলখাগড়া, বাঁশ প্রভৃতি কাঁচামাল হিসেবে এবং হরিপুরের গ্যাস শক্তি হিসেবে এ কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এ কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫ হাজার টন।

এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জের মেঘনা ঘাটের নিকট বসুন্ধরা, মাগুরা ও শাহজালাল নামে কাগজকল রয়েছে।

৫। **খুলনা হার্ডবোর্ড মিল** : ১৯৬৬ সালে খুলনার খালিশপুরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুন্দরী ও গোয়া কাঠ কাঁচামাল হিসেবে এ মিলে ব্যবহৃত হয়। এ মিলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ হাজার টন।

৬। **অন্যান্য কারখানা** : এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জের পার্টিকেল বোর্ড মিল, কাস্তাই ও টঙ্কীর বোর্ড মিলগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সার শিল্প

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশের চাহিদা মিটানোর জন্য ১৯৬১ সালে সর্বপ্রথম সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ একটি সার কারখানা স্থাপিত হয়। বর্তমানে দেশে সার কারখানার সংখ্যা ৮টি।

গড়ে ওঠার কারণ : প্রাকৃতিক গ্যাস হিসেবে সহজলভ্য কাঁচামাল, স্থানীয় তাপবিদ্যুৎ শক্তি, ব্যাপক বাজার, সুলভ শ্রমিকের প্রাপ্যতা, দেশি বিদেশি মূলধনের প্রাচুর্য প্রভৃতি কারণে দেশের কতিপয় স্থানে দ্রুত এ শিল্প গড়ে উঠেছে।

উৎপাদন : ২০০১-২০০২ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন সার কারখানায় প্রায় ১৭.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন ধরনের সার উৎপন্ন হয় (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণি ২৭)। ২০০৬-২০০৭ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন সার কারখানায় প্রায় ১৯.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন ধরনের সার উৎপন্ন হয়। উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণি-২৭)।

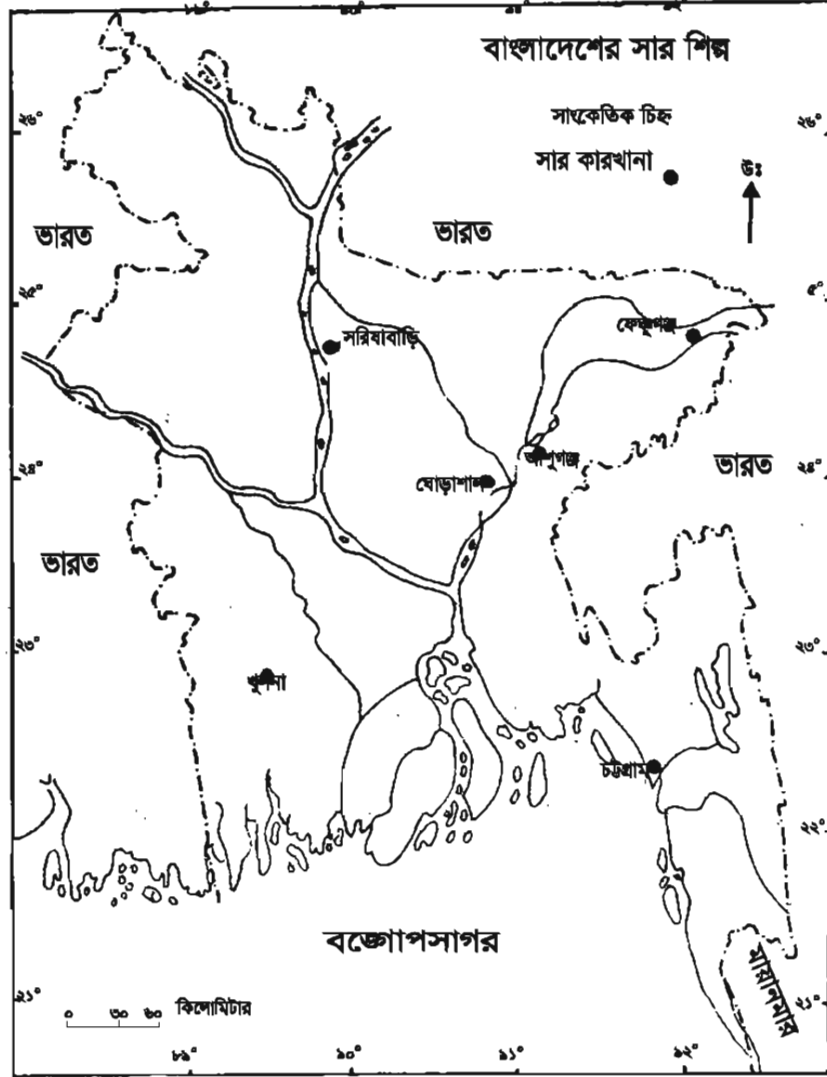
নিম্নে বাংলাদেশের সার শিল্পের বর্ণনা দেওয়া হল—

১। **ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা** : ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে এ সার কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস এ কারখানার প্রধান কাঁচামাল। এখানে প্রধানত ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়।

২। **ঘোড়াশাল সার কারখানা** : ১৯৭০ সালে নরসিংদী জেলার ঘোড়াশালে এ কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় তিতাস গ্যাসই এ কারখানার প্রধান কাঁচামাল। এ কারখানার নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। এখানে বার্ষিক প্রায় ৩ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপন্ন হয়।

৩। **আশুগঞ্জ জিয়া সার কারখানা** : মেঘনা নদীর তীরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জে এ কারখানাটি অবস্থিত। এটি বার্ষিক প্রায় ৫.৩০ লক্ষ ইউরিয়া উৎপাদনে সক্ষম। স্থানীয় তিতাস গ্যাসই এর প্রধান কাঁচামাল।

৪। **পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা** : ১৯৮৫ সালে নরসিংদী জেলার পলাশে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে এ কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বার্ষিক প্রায় ৯৫ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদনে সক্ষম। তিতাস গ্যাস পলাশ ইউরিয়া সার কারখানার প্রধান কাঁচামাল।



চিত্র ১১.৫ : বাংলাদেশের সার শিল্প

৫। অন্যান্য সার কারখানা : চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট ও ইউরিয়া সার কারখানা, খুলনা ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা এবং সরিষাবাড়ির যমুনা সার কারখানা থেকে প্রচুর সার উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য : বাংলাদেশ সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ২০০১-০২ সালে ১০.৭ কোটি ইউএস ডলার মূল্যের সার আমদানি করে (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণি ৪৩)। ২০০৭-২০০৮ সালে ৪.১০ কোটি ইউএস ডলার মূল্যের সার আমদানি করা হয় (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি-৫১)।

সিমেন্ট শিল্প

আধুনিক সভ্যতায় সিমেন্ট একটি মূল্যবান দ্রব্য। দেশের পূর্তকর্ম ও উন্নয়নমূলক নির্মাণ কাজের জন্য সিমেন্টের ব্যবহার অপরিহার্য। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে একটি মাত্র সিমেন্ট কারখানা ছিল। এটি হল সুনামগঞ্জের ছাতক সিমেন্ট কারখানা। বর্তমানে দেশে ১২টি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে (উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুলেটিন, এপ্রিল ২০০৮, সারণি-৫.১৫)।

গড়ে ওঠার কারণ : দেশীয় চুনাপাথর, প্রাকৃতিক গ্যাস, স্থানীয় ব্যাপক চাহিদা, সুলভ শ্রমিকের প্রাপ্যতা, সরকারি সাহায্য সহযোগিতা প্রভৃতি কারণে এদেশে সিমেন্ট শিল্প গড়ে উঠেছে।

উৎপাদন : ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১৭.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয় (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণি ২৭)। ২০০৬-২০০৭ সালে বাংলাদেশের প্রায় ৩৪.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয় (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি-৩৩)।

নিম্নে বাংলাদেশের সিমেন্ট কারখানার বর্ণনা দেওয়া হল—

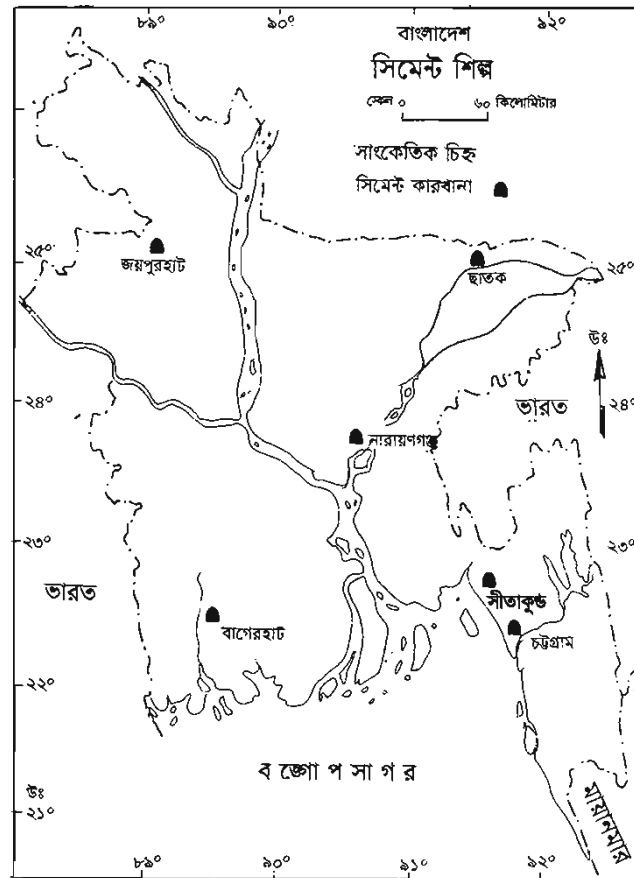
১। ছাতক সিমেন্ট কারখানা : ১৯৪০ সালে এ কারখানাটির উৎপাদন শুরু হয়। এর উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১.৫০ লক্ষ টন। সুনামগঞ্জের চূনাপাথর ও ছাতকের প্রাকৃতিক গ্যাস এ কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে।

২। চট্টগ্রাম সিমেন্ট কারখানা : ৬ লক্ষ টন ক্ষমতা সম্পন্ন চট্টগ্রামের এ সিমেন্ট কারখানাটি ১৯৭৫ সালে চালু হয়। বর্তমানে এ কারখানায় বার্ষিক প্রায় ২.১৫ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয়। এ কারখানার জন্য বিদেশ থেকে ক্লিংকার বা খণ্ড চূনাপাথর আমদানি করা হয়।

৩। জয়পুরহাট সিমেন্ট কারখানা : জয়পুরহাটের সিমেন্ট কারখানাটির উৎপাদন শীঘ্রই শুরু হবে। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬.৬০ লক্ষ টন। স্থানীয় চূনাপাথরই এর প্রধান কাঁচামাল।

৪। অন্যান্য সিমেন্ট কারখানা : সীতাকুণ্ডে কনফিডেন্স, বাগেরহাটে মংলা ও মেঘনা, নারায়ণগঞ্জে হুন্দাই, সুনামগঞ্জে আইনপুর, কুমিল্লার দাউদকান্দি ও যশোরের নোয়াপাড়ায় সিমেন্ট কারখানা রয়েছে।

বাণিজ্য : বাংলাদেশ সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশ .৬ কোটি ইউএস ডলার মূল্যের সিমেন্ট আমদানি করে (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণি ৪৩)। ২০০৭-২০০৮ সালে বাংলাদেশ ২.২১ কোটি ইউ.এস ডলার মূল্যের ক্লিংকার আমদানি করে (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি-৫)।



চিত্র ১১.৬ : বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প

বাণিজ্য

পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে। একদেশের সঙ্গে অন্যদেশের পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। বাংলাদেশেরও বৈদেশিক বাণিজ্য রয়েছে।

বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

(ক) কাঁচামাল রপ্তানি ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি, (খ) রপ্তানি দ্রব্যের তুলনায় আমদানি দ্রব্যের সংখ্যা ও পরিমাণ অনেক বেশি, (গ) বিলাস দ্রব্য আমদানি, (ঘ) বাণিজ্যের ওপর বিদেশিদের প্রাধান্য, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক এবং (ঙ) লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিকূলে ইত্যাদি।

পরিমাণ : ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশ প্রায় ৫৯৮.৬ কোটি ইউএস ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি এবং ৮৫৪.০ কোটি ইউএস ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করে (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণি ৪২ ও ৪৩)। ২০০৭-২০০৮ সালে ১৩৩.৬০ কোটি ইউএস ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে এবং ১৩৩.৮৮ কোটি ইউএস ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করে (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি-৫১)।

বাণিজ্যের বিবরণ : বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিম্নে আলোচিত হল—

রপ্তানি বাণিজ্য : বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য, মাংস, চিথড়ি ও ব্যাঙের পা, ন্যাপথা, ফার্নেস তেল, তৈরী পোশাক, রাসায়নিক সার, কৃষিপণ্য, হস্তজাত দ্রব্য ইত্যাদি রপ্তানি হয়ে থাকে। এ সকল দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ২০০৭-২০০৮ সালে প্রায় ১০১.৬০ কোটি ইউএস ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। তবে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরী পোশাক, হিমায়িত খাদ্য এবং চামড়ার মাধ্যমেই শতকরা ৪৬.৮৮ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া পোশাকের মাধ্যমেই শতকরা প্রায় ৩৭.১১ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৪৯)।

আমদানি বাণিজ্য : বাংলাদেশের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল, পেট্রোলিয়াম, বস্ত্র, সুতা, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট, কলকজা, যানবাহন, লোহা, ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কাগজ, রবার, তেলবীজ, বইপত্র, বিভিন্ন ধরনের ধাতব পদার্থ, চলচ্চিত্র ইত্যাদি আমদানি করা হয়। ২০০৭-০৮ সালে এ সকল দ্রব্যের আমদানি বাবদ প্রায় ১৩৩.৮৮ কোটি ইউএস ডলার ব্যয় হয়।

বাণিজ্যিক সম্পর্ক : স্বাধীনতার পর পরই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং আরও নতুন নতুন দেশের সঙ্গে এ সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পণ্য আদান প্রদানের মাধ্যম : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ সমুদ্রপথেই হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমেই অধিকাংশ পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হয়ে থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়া কোনো দেশই অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করতে পারে না। তাই বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ সরকার সর্বদা তৎপর রয়েছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কোনটি ?

ক. পাট

খ. চিনি

গ. বস্ত্র

ঘ. সার

২. বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প গড়ে ওঠার কারণ হল—

i. কাঁচামাল আমদানির সুবিধা

ii. দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক

iii. স্থানীয় ব্যাপক বাজার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ থেকে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

নীরার বাবা চট্টগ্রামস্থ আমিন জুট মিলস লিঃ-এর একজন কর্মকর্তা। আগ্রহের বশে সে একদিন তার বাবার কর্মস্থলে গেল। সেখানে সে মিলের উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের পণ্য দেখল। সে তার বাবার কাছে বাংলাদেশে মোট পাটকলের সংখ্যা ও তাদের অবস্থান জানতে চাইল। বাবা মানচিত্র দেখিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা পাটকলের অবস্থান দেখালেন।

৩. বাংলাদেশের পাট শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলো হচ্ছে—

- | | |
|---|--|
| ক. চট্টগ্রাম, খুলনা, ঘোড়াশাল ও ঢাকা | খ. খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও চৌমুহনী |
| গ. ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা | ঘ. চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, চৌমুহনী ও খুলনা |

৪. নিম্নের কোনগুলো পাটজাত দ্রব্য ?

- চট, বস্তা, কার্পেট
- কার্পেট ব্যাকিং, দড়ি, গালিচা
- মোটা কাপড়, সূক্ষ্মকাপড়, চট

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. কোন অঞ্চলে দেশের অধিকাংশ পাটকল অবস্থিত ?

- | | |
|--------------|------------|
| ক. চট্টগ্রাম | খ. ঢাকা |
| গ. খুলনা | ঘ. রাজশাহী |

৬. বাংলাদেশকে প্রতিবছর প্রচুর সুতা ও বস্ত্র আমদানি করতে হয়। কারণ—

- বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ
- বাংলাদেশে সুতা ও বস্ত্র উৎপাদিত হয় না
- বাংলাদেশ বন শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|-------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. iii | ঘ. ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও ভালো অবস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রায়ই ঘাটতির সম্মুখীন হয়। ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৫৪ কোটি ইউএস ডলার ও ৫৯৬.৬ কোটি ইউএস ডলার।

৭. বাণিজ্য ঘাটতি বলতে বুঝায়—

- আমদানির পরিমাণের চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ বেশি
- আমদানির পরিমাণের চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ কম
- আমদানির পরিমাণ এবং রপ্তানির পরিমাণ সমান
- আমদানির পরিমাণ শূন্য এবং রপ্তানির পরিমাণ অসীম

৮. ২০০১ - ০২ সালে বাংলাদেশে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ কত?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ক. ২৫৭.৪ কোটি ইউএস ডলার | খ. ৫৯৫.৮ কোটি ইউএস ডলার |
| গ. ১২৮০.০ কোটি ইউএস ডলার | ঘ. ১৪৫০.৬ কোটি ইউএস ডলার |

৯. বাংলাদেশে শিল্পায়নের জন্য প্রধানত দরকার –

- ভারী শিল্পের উন্নয়ন
- কৃষি খাতের উন্নয়ন
- কার্যকর শিল্পনীতি গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে পাট শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলো হল নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও ঢাকা। খুলনার বস্ত্রকলটি বন্ধ হয়ে যাওয়াতে নাদিরা শরকিত। যেখানে বস্ত্র ও সুতার চাহিদা মেটাতে বিশ্ববাজার থেকে কয়েকশ কোটি টাকার মূল্যের বস্ত্র ও সুতা আমদানি করতে হয়, সেখানে বাংলাদেশে অনুকূল পরিবেশ থাকার পরেও বস্ত্রকল বন্ধ হয়ে যাওয়া দেশীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে বলে নাদিরা মনে করে। তার মতে, বস্ত্রকলগুলো যাতে বন্ধ না হয় সেদিকে সচেতন হতে হবে।

- বাংলাদেশের বস্ত্রকলে সাধারণত কত ধরনের কাপড় তৈরি হয়?
- কী ধরনের অনুকূল পরিবেশ থাকার কারণে বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছে?
- অঞ্চলভিত্তিক বস্ত্রশিল্পের বস্টন দেখিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন কর।
- বস্ত্রকলগুলো বন্ধ হলে দেশীয় অর্থনীতি এবং শ্রম বাজারে বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে নাদিরার বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২. নিম্নের ছকের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আমদানি বাণিজ্য	রফতানি বাণিজ্য
খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, পেট্রোলিয়াম, বস্ত্র, সুতা, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, যানবাহন।	পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য, মাংস, চিথড়ি, তৈরি পোশাক।
ব্যয়: ৮৫৪ কোটি ইউএস ডলার	আয় : ৫৯৮.৬ কোটি ইউএস ডলার

- বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্য কীরূপ?
- এরূপ ভারসাম্য অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্ণনা কর।
- ওপরের ছকের তথ্যের আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।
- বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের এ অবস্থার অবসানের উপায় বিশ্লেষণ কর।

৩. স্বর্ণালী তার ভাইয়ের জন্মদিনে রথবেরঙের কাপড় কেটে ঘর সাজাচ্ছিল, হঠাৎ সে তার বাবাকে প্রশ্ন করল। আচ্ছা বাবা কাগজগুলো কোথা থেকে আসে, সাদা কাগজ থেকে তা রঙিন হয় কী করে? তার বাবা উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি আরও জানায় যে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানে তা গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশও

রয়েছে। স্বর্ণালী আরও জানতে পারল ১১টি কাগজকল থাকা সত্ত্বেও কাগজের প্রয়োজনীয় চাহিদা আমাদের পক্ষে মেটানো সম্ভব হয় না।

- ক. বাংলাদেশের প্রথম কাগজকলের নাম কী?
- খ. এই কাগজকল গড়ে ওঠার প্রধান কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে কাগজকলের অবস্থান চিহ্নিত কর।
- ঘ. বাংলাদেশে কাগজের উৎপাদন কীভাবে বাড়ানো যায়, মতামত দাও।

৪. রানু তার বাবার সঙ্গে নাটোর থেকে চট্টগ্রাম বেড়াতে এসেছে। চট্টগ্রামে সে অনেকগুলো শিল্প কারখানা দেখতে পেলো কোনো চিনি শিল্প কারখানা খুঁজে পায়নি। এর কারণ জানতে চাইলে তার বাবার বলেন বাংলাদেশের চিনি, কলগুলো রাজশাহী, ঢাকা ও খুলনা বিভাগ গড়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম বন্দর ভ্রমণে এসে সে জাহাজ থেকে মালামাল ওঠানামার দৃশ্য দেখতে পায়। সে জানতে পারে এ মালামালের মধ্যে আমদানি ও রফতানি উভয় পণ্যই আছে। তবে আমদানি পণ্যের পরিমাণ রফতানির তুলনায় বেশি। রানুর বাবা বললেন, যদি দেশে অধিক হারে শিল্প স্থাপন করা যায় তবে আমদানি অনেক কমানো সম্ভব।

- ক. কী ধরনের বাগিজের কাজে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহৃত হয়?
- খ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাগিজের প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
- গ. রানু চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোনো চিনির কল খুঁজে পায়নি কেন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. আমদানি হ্রাস সম্পর্কে রানুর বাবার বক্তব্য মূল্যায়ন কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংবিধান

সংবিধানের সংজ্ঞা : রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের কিছু নির্দিষ্ট বিধিবিধান বা আইন থাকে। এই বিধিবিধানকে রাষ্ট্রের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলা হয়। সংবিধানের মাধ্যমে একটি সরকারের নিজস্ব রূপ বোঝা যায়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, “সংবিধান হল রাষ্ট্রের সেই জীবনধারা যা রাষ্ট্র নিজেই বেছে নিয়েছে।” সহজ কথায় আমরা বলতে পারি, “সংবিধান হচ্ছে সেসব নীতিমালা যা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি নির্ধারণ করে এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে।” সংবিধান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মৌলিক দলিল। সংবিধান ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারে না। এটি সরকারের সংগঠন ও রাজনৈতিক জীবন নির্ধারণ করে।

সংবিধানের প্রকারভেদ : সংবিধানকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা যায়— (ক) লিখিত সংবিধান ও (খ) অলিখিত সংবিধান।

লিখিত সংবিধান : লিখিত সংবিধান বলতে আমরা সেই সংবিধানকে বুঝি যার বিভিন্ন ধারা একটি দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। দেশের জনপ্রতিনিধিরা এটা রচনা করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত। লিখিত সংবিধান স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। লিখিত সংবিধান সাধারণত দুশ্রবর্তনীয় হয়। অর্থাৎ সহজে সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না।

অলিখিত সংবিধান : অলিখিত সংবিধান বলতে আমরা সেই সংবিধানকে বুঝি যার ধারা বা নিয়মাবলি কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-প্রথা অথবা বিচারকদের রায়ে তা গড়ে উঠে। যুক্তরাজ্যের সংবিধান অলিখিত। এটি অস্পষ্ট ও অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নয়। অলিখিত সংবিধান ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। এটি সাধারণত সুপরিবর্তনীয়। অলিখিত সংবিধানে আবার কিছু কিছু লিখিত অংশ থাকে। যেমন যুক্তরাজ্যের সংবিধান।

সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে আবার সংবিধানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়— (ক) সুপরিবর্তনীয় এবং (খ) দুশ্রবর্তনীয়।

সুপরিবর্তনীয় সংবিধান : সুপরিবর্তনীয় সংবিধান হল এমন এক সংবিধান যা পরিবর্তন করার জন্য কোনো পৃথক বা জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। আইনসভার সাধারণ আইনের মতো তা পরিবর্তন ও সংশোধন করা যায়। এটা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এ সংবিধান সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সহায়ক। পরিবর্তনীয় সংবিধানের অন্যতম ত্রুটি স্থিতিহীনতা। এটা সহজে পরিবর্তন করা যায়। একারণে অনেক ক্ষেত্রে সংবিধানের সুস্পষ্টতা ব্যাহত হয়ে থাকে।

দুশ্রবর্তনীয় সংবিধান : দুশ্রবর্তনীয় সংবিধান বলতে সেই সংবিধানকে বোঝায় যা সংশোধন বা পরিবর্তন করার জন্য জটিল এবং বিশেষ পদ্ধতির দরকার হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা বাংলাদেশের সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না।

বাংলাদেশের সংবিধানের কোনো অংশ পরিবর্তন করতে হলে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের প্রয়োজন হয়। দুশ্রবর্তনীয় সংবিধান প্রধানত সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও স্থিতিশীল।

উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য : উত্তম সংবিধানের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হল—

- (১) **লিখিত :** উত্তম সংবিধান লিখিত হয়। এতে শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন পদ্ধতি ও নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে;
- (২) **মৌলিক অধিকার :** সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকলে তা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না;
- (৩) **সুষম প্রকৃতি :** সংবিধানে সুপরিবর্তনীয় ও দুশ্রবর্তনীয় পদ্ধতির সমন্বয় থাকলে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হয়;

অনুশীলনী

- ক. কখন আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়?
খ. সংশোধন পন্থতির আলোকে বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়—ব্যাখ্যা কর।
গ. বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের সংবিধান সংশোধন পন্থতির তুলনা দেখাও।
ঘ. সংবিধান ছাড়া কোনো রাষ্ট্র চলতে পারে না—বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ক বাংলাদেশের সংবিধান

সংবিধানের ইতিহাস : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান শাসনামলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা ও নিরস্ত্র বাঙালিদের গণহত্যাকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। পরে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি বড় অংশের উপস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরে (মুজিবনগর) আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ঐ দিন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। নবগঠিত সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয়। তবে তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। দীর্ঘ ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় সূচিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। এই আদেশবলে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে নতুন সংবিধান রচনার জন্য গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল এ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে ৩৪ জন সদস্যের একটি সংবিধান কমিটি গঠিত হয়। ড. কামাল হোসেন ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল সংবিধানের খসড়া রচনা করা। গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের ওপর সাধারণ আলোচনা ও সংশোধনী শেষ হয় ১৯৭২ সালের ৩০শে অক্টোবর। অবশেষে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদের সকল সদস্যের অনুমোদনক্রমে সংবিধানটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, “এই সংবিধান লিখিত হয়েছে লাখো শহীদের রক্তের অঙ্করে।” এরপর বিভিন্ন সময়ে সংশোধনীর মাধ্যমে এ সংবিধান পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হল—

- ১। **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ :** সংবিধান মতে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হবে;
- ২। **সর্বোচ্চ আইন :** সংবিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ যে কোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হবে;
- ৩। **লিখিত সংবিধান :** এ সংবিধান একটি লিখিত দলিল। সংবিধানের সূচনায় একটি প্রস্তাবনা আছে;
- ৪। **সংসদীয় গণতন্ত্র :** এ সংবিধানে বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচালনা করবে এবং মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে;
- ৫। **রাষ্ট্রীয় মূলনীতি :** এ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সন্নিবেশিত রয়েছে;
- ৬। **এককেন্দ্রিক সরকার :** এ সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসন প্রবর্তন করা হবে;
- ৭। **এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা :** বাংলাদেশ সংবিধানে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ৩০০ জন গণপ্রতিনিধি এবং তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত ৩০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে আইনসভা গঠিত হয়। বর্তমানে মহিলাদের ৩০ টি সংরক্ষিত আসনের স্থলে ৪৫ টি আসন থাকায় সংসদের সদস্য সংখ্যা ৩৪৫ জন।
- ৮। **মৌলিক অধিকার :** সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। যেমন— জীবনধারণের অধিকার; মত প্রকাশের স্বাধীনতা; অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা; সমাবেশ, সংগঠন, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা; পেশা, বৃত্তি ও সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এসব অধিকার সত্বক্ষণের ব্যবস্থাও সংবিধানে রয়েছে;
- ৯। **জনগণের সার্বভৌমত্ব :** রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ক্ষমতা পরিচালনা করবে;
- ১০। **বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা :** এ সংবিধানে বিচার বিভাগের প্রাধান্য ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে;
- ১১। **সংবিধান সংশোধন :** সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যাবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়—
 - প্রশাসনিক সুবিধা
 - ভৌগোলিক অবস্থান
 - প্রতিনিধির জনপ্রিয়তা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদ পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

নাবিদের বয়স ১৩ বছর। সে অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্র হিসেবে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে নাগরিকের রাষ্ট্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থা, নির্বাচনী এলাকা, ভোটাধিকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে তার যথাযথ ধারণা রয়েছে।

- নাবিদ বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সে—
 - ভোট দিতে পারবে।
 - প্রার্থী হতে পারবে।
 - ভোটদানে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. iii | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য-

- গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

- বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে ঘটনার সময় এবং তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি ছক তৈরি করা হল যা নিম্নরূপ—

সময়	তথ্য
১. ১৬ ডিসেম্বর ৭১	১. বাংলাদেশের বিজয়
২. ১১ জানুয়ারি ৭২	২. অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি
৩. ২৩ মার্চ ৭২	৩. গণপরিষদের গঠন
৪. ১০ এপ্রিল ৭২	৪. কামালের সভাপতিত্বে কমিটি গঠন
৫. ৩০ অক্টোবর ৭২	৫. আলোচনা সংশোধনী
৬. ০৪ নভেম্বর ৭২	৬. চূড়ান্ত অনুমোদন

- ‘অস্থায়ী সংবিধান আদেশ’ জারি করেন কে ?
- সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে গণপরিষদ গঠনের প্রয়োজন হয় কেন ?
- উপরিউক্ত ছক এবং তথ্য অনুসরণ করে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস বর্ণনা কর।
- বাংলাদেশের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলাদেশের সংবিধানকে উত্তম সংবিধান বলা যায় কি? মতামত দাও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ খ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

নির্বাচন কী?

অতীতকালে রাষ্ট্রের আয়তন যখন ছোট ছিল তখন রাষ্ট্র পরিচালনায় নাগরিকগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করত। আধুনিককালে রাষ্ট্রের আয়তন বিশাল এবং জনসংখ্যাও অনেক বেশি। ফলে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তারা প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকগণ জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য একাধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে যথাসম্ভব উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে তাকে বলা হয় নির্বাচন। বর্তমান বিশ্বে নির্বাচনই হল সব রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা এবং কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু। নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নাগরিকদের মতামত প্রকাশিত হয়। সরকারও সে অনুযায়ী দেশ পরিচালনার সুযোগ পায়। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের মতামত সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

বর্তমান বিশ্বে প্রায় সকল রাষ্ট্রেই নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক বেশি। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। আর তাই সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে নাগরিকদের বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা, নির্বাচনী এলাকা, ভোটার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি, ভোটাধিকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো হল—

- ১। এদেশে বহুদলীয় নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
- ২। এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।
- ৩। এদেশে মূলত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। শাসন ব্যবস্থায় সকল প্রতিনিধি (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিরেকে) জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।
- ৪। এখানে গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- ৫। এদেশে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়।
- ৬। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।
- ৭। পদ্ধতিগত দিক থেকে এদেশের নির্বাচন সহজবোধ্য, সহজসাধ্য এবং উত্তম প্রকৃতির।

নির্বাচনী এলাকা

প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সাধারণত গোটা দেশকে কতগুলো নির্দিষ্ট এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এরূপ প্রতিটি নির্দিষ্ট এলাকাকে এক একটি নির্বাচনী এলাকা বলা হয়। নির্বাচনে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একাধিক ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণাও এলাকাভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন—জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশকে ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে। প্রশাসনিক সুবিধা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং জনসংখ্যা ইত্যাদির ভিত্তিতে এসব নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

ভোটার রেজিস্ট্রেশন

ভোটার রেজিস্ট্রেশন এবং ভোটার তালিকা প্রণয়ন নির্বাচনের পূর্বশর্ত। নির্বাচনের পূর্বে সঠিক এবং নির্ভুলভাবে ভোটার তালিকা প্রণয়নের ওপর সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই ভোটার রেজিস্ট্রেশনের কাজটি যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকদের দ্বারা একটি তথ্য বা রেজিস্ট্রেশন

ফরম স্বহস্তে পূরণের মাধ্যমে ভোটার রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে এই রেজিস্ট্রেশন ফরম-এর ওপর ভিত্তি করেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। নিম্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী একজন ব্যক্তি ভোটার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন যদি তার আর কোনো অযোগ্যতা না থাকে—

- (১) বাংলাদেশের নাগরিক।
- (২) ১৮ বছর বা তদোর্ধ্ব বয়স।
- (৩) সৎশ্রীষ্ট ভোটার এলাকার বাসিন্দা এবং
- (৪) সৎবিধান ও সৎশ্রীষ্ট আইনে বর্ণিত যোগ্যতা থাকলেই কেবল একজন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারেন।

ভোটার রেজিস্ট্রেশন ফরম-এ ভুল এবং মিথ্যা তথ্য পরিবেশন দণ্ডনীয়। কোনো ব্যক্তি ভুল মিথ্যা তথ্য দিলে সর্বোচ্চ ছয় মাসের জেল বা সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

ভোটাধিকার প্রয়োগ

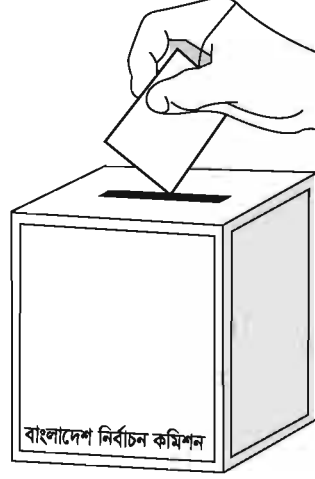
নির্বাচনে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারই হল ব্যক্তির ভোটাধিকার। এটি ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার। রাষ্ট্র নাগরিককে এই ভোটাধিকার দেয়। নাগরিকের ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগের ওপর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তাই নাগরিকের দায়িত্ব হল ভোটাধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। এটি সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। ভোটাধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ না করলে অযোগ্য এবং অসৎ লোক নির্বাচিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এতে দেশের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। সে কারণে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাগরিকদের কতগুলো বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। যেমন –

- (১) আঠার বছর পূর্ণ হলেই ভোটার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ভোটার তথ্য সঞ্চারকারী কর্তৃক প্রদত্ত ফরম স্বহস্তে পূরণ করে অথবা নিকটস্থ নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করে নির্বাচনের পূর্বে নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত এই রেজিস্ট্রেশন করা যায়।
- (২) একজন ভোটার কেবল একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে রেজিস্ট্রেশন করবেন। রেজিস্ট্রেশনের পর কোনো কারণে আবাসস্থল পরিবর্তিত হলে নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
- (৩) ভোটদান প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। তাই ব্যক্তি অবশ্যই নিজে ভোট দিবেন এবং অন্যকেও ভোট দিতে উৎসাহিত করবেন।
- (৪) বিচার ও বিবেকের সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কখনও নিজের ভোটাধিকারের অপব্যবহার করা উচিত নয়।
- (৫) একজন ভোটার কেবলমাত্র একটি ভোট দিবেন। কোনো ব্যক্তি নিজে ভোট নিয়ে প্রতারণা করবেন না এবং অন্যকেও প্রতারণার সুযোগ দিবেন না।
- (৬) ব্যক্তির মূল্যবান ভোটটি যেন কোনো কারণে নষ্ট না হয় সে উদ্দেশ্যে ভোট দানের পূর্বেই ভোট দান কেন্দ্র, ভোট দান পদ্ধতি, নিজের ভোটার নম্বর ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিতে হবে এবং সময়মতো ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের ওপর সরকার পরিচালনার দক্ষতা, সুশাসন এবং দেশের মজল নির্ভর করে। সে কারণে অবশ্যই যথার্থ বিচার বিবেচনার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে। কোনোভাবেই অযোগ্য, অদক্ষ ও অসৎ লোককে নির্বাচিত করা উচিত নয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



চিত্র

- ক. উপরের চিত্রে নাগরিকের কোন অধিকার প্রয়োগকে বুঝানো হয়েছে?
 খ. এই অধিকার প্রয়োগের প্রধান কারণ ব্যাখ্যা কর।
 গ. এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক হতে হবে?
 ঘ. “যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের ওপর দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে”— উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২. হামীম অফিম শ্রেণীর ছাত্র। সে লক্ষ করেছে কিছুদিন আগে দেশে নির্বাচনের প্রয়োজনে ভোটার রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু হয়েছে। তাদের পরিবারের ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সসীমার সদস্যগণ প্রথমে একটা রেজি: ফর্ম পূরণ করেছেন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে ছবি তুলেছেন। তবে ঐ এলাকার অস্থায়ী বাসিন্দা এবং বিদেশি লোকেরা রেজি: করতে পারেননি। সে জেনেছে যে, কিছুদিনের মধ্যে বৈধ নাগরিকগণ ভোটার রেজি: কার্ড পেয়ে যাবেন।

- ক. নির্বাচন কী ?
 খ. ভোটার রেজি:—এর একটি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
 গ. হামীমের অভিজ্ঞতার আলোকে ভোটার রেজি: করা প্রয়োজন কেন?
 ঘ. নিখুঁত ভোটার রেজি: কার্যকর নির্বাচনের পূর্বশর্ত —এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

৩. নাবিদ সাহেব সিলেট জেলার কালীঘাটের একজন সচেতন নাগরিক। তিনি জানেন নাগরিকের ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগের ওপর উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অন্যথায় অযোগ্য এবং অসৎ লোক নির্বাচিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন ভোটারদের অসচেতনতার কারণে বাংলাদেশে অনেক অযোগ্য ও অসৎ লোক নির্বাচিত হয়েছে। এজন্য সচেতন নাগরিক হিসেবে সকলেরই নির্বাচনী আচরণ, ভোটার রেজিস্ট্রেশন, ভোটাধিকার প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে জানা থাকা দরকার।

- ক. নির্বাচন কী ?
 খ. নাবিদ সাহেব কেন ভোটার রেজিস্ট্রেশন ভুক্ত হবেন ?
 গ. অসৎ ও অযোগ্য লোক যাতে নির্বাচিত হতে না পারে সেজন্য নাবিদ সাহেবকে কোন কোন বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে ?
 ঘ. ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখা সম্ভব— মতামত দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাতিসংঘ

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিভীষিকা থেকেই জাতিসংঘের জন্ম। যুদ্ধ মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। সেজন্য যুদ্ধের সাথে সাথে চলে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিপুঞ্জ বা লীগ অব নেশনস। এ বিশ্বসংস্থা শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৮ সালে এর অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এর ধ্বংসলীলা দেখে বিশ্ববাসী হতবাক, স্তম্ভিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠে। বিশ্ববাসী উপলব্ধি করে যে, মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এভাবেই জাতিসংঘের ধারণার প্রথম সূত্রপাত ঘটে ১৯৪১ সালে। বিশ্বশান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আটলান্টিক মহাসাগরে এক রণতরীতে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মিলিত হন। ১৯৪১ সালের ১২ই আগস্টে তাঁরা একটি শান্তি পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেন। এটি বিখ্যাত ‘আটলান্টিক সনদ’ নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীবর্গ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য মস্কো ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেন।

এ ঘোষণায় ‘জাতিসংঘ’ এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা থাকে। মস্কো ঘোষণার পর ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিন তেহরানে এক সম্মেলনে মিলিত হন।

তেহরান ঘোষণার পর ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে ওয়াশিংটন ডিসির উপকণ্ঠে ডাম্মারটন ওকস শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জাতিসংঘের খসড়া সনদ প্রণয়ন করা হয়।

এরপর ১৯৪৫ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ৫১টি দেশের প্রতিনিধিগণ উক্ত সনদ অনুমোদন করেন। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর থেকে জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়। ঐ সময় থেকে প্রতিবছর ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৪৬ সালের ১০ই জানুয়ারি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘ সনদের নিয়ম কানুন মেনে চলার শর্তে বিশ্বের যে কোনো শান্তিকামী দেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদ নতুন সদস্য গ্রহণ করে থাকে।

জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯২। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত। হালকা নীল রঙের মাঝখানে একটি সাদা বৃত্ত এবং এ বৃত্তের মধ্যে জাতিসংঘের প্রতীক নিয়ে জাতিসংঘের পতাকা তৈরী। জাতিসংঘের মহাসচিবই হচ্ছেন জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নরওয়ের অধিবাসী ট্রিগভেলী ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব। বর্তমান মহাসচিবের নাম বান কি মুন। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

জাতিসংঘ একটি বিশ্বপ্রতিষ্ঠান। ছয়টি মূল সংস্থা নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান গঠিত যথা— (১) সাধারণ পরিষদ, (২) নিরাপত্তা পরিষদ (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (৪) অছি পরিষদ (৫) আন্তর্জাতিক আদালত এবং (৬) জাতিসংঘ সচিবালয়। এ ছয়টি মূল সংস্থার মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে।

(১) সাধারণ পরিষদ : জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য। সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোট দানের অধিকার রয়েছে। সাধারণত বছরে একবার এ পরিষদের অধিবেশন বসে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতেই সদস্যদের—ভোটে পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। পরিষদের কার্যবিধি পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এ পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাসহ জনকল্যাণ ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা করে। তাছাড়া মহাসচিব নিয়োগ, নতুন সদস্য গ্রহণ, কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে বহিষ্কার, জাতিসংঘের বাজেট পাস,

সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ, বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন, অন্যান্য সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ পরিষদ সম্পাদন করে।

(২) **নিরাপত্তা পরিষদ** : পাঁচটি স্থায়ী সদস্য ও ১০টি অস্থায়ী সদস্য—মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলো হল যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও গণচীন। এদের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ কোনো প্রস্তাবে এদের কেউ দ্বিমত পোষণ করলে সে প্রস্তাব আর অনুমোদিত হয় না। এ পরিষদ আলাপ আলোচনা, আপোষ, মধ্যস্থতা ও সালিশীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তির চেষ্টা চালায়। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এ পরিষদের ওপর ন্যস্ত।

(৩) **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ** : এ পরিষদের কাজ হল মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, শিক্ষার প্রসার এবং মানবাধিকার কার্যকর করা। বিভিন্ন কল্যাণমূলক বিষয়ে সাধারণ পরিষদে সুপারিশ প্রেরণ করাও এ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ৫৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। প্রতি তিন বছরে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করে। বছরে কমপক্ষে দুবার নিউইয়র্ক অথবা জেনেভায় এর অধিবেশন বসে। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোটের অধিকার রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের কয়েকটি সহযোগী আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে। যেমন, (ক) মানবাধিকার সংস্থা, (খ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (গ) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ঘ) শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (ঙ) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (চ) জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ছ) উন্নয়ন কর্মসূচি।

(৪) **অছি পরিষদ** : অছি পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ কতিপয় অনুন্নত অঞ্চলের তত্ত্বাবধানের ভার নেয়। অছিভুক্ত অঞ্চলের উন্নতি এবং এলাকার অধিবাসীদের স্বাধীনতা তথা দেশ শাসনের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই হচ্ছে অছি পরিষদের দায়িত্ব।

(৫) **আন্তর্জাতিক আদালত** : আন্তর্জাতিক আদালত হচ্ছে জাতিসংঘের বিচারালয়। পনের জন বিচারকের সমন্বয়ে এ আদালত গঠিত। বিচারকদের চাকরি কাল নয় বছর। নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে এটি অবস্থিত। আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের যে কোনো সদস্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার প্রার্থী হতে পারে। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কার্যকরী হয়।

(৬) **জাতিসংঘ সচিবালয়** : জাতিসংঘের সচিবালয় মহাসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত। প্রধান কর্মকর্তা হচ্ছেন মহাসচিব। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। সচিবালয় বা সেক্রেটারিয়েট জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ। মহাসচিব জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। কতগুলো বিভাগ নিয়ে জাতিসংঘ সচিবালয় গঠিত। এ বিভাগগুলো হল— (ক) নিরাপত্তা পরিষদ সংক্রান্ত বিভাগ, (খ) সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ, (গ) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ, (ঘ) অছিগিরি সংক্রান্ত বিভাগ, (ঙ) আইন সংক্রান্ত বিভাগ (চ) সম্মেলন সংক্রান্ত বিভাগ, (ছ) আন্তর্জাতিক গণসংযোগ সংক্রান্ত বিভাগ, (জ) সাধারণ প্রশাসন ও অফিস প্রশাসন সংক্রান্ত বিভাগ এবং (ঝ) জাতিসংঘের অফিস ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগের কাজ একজন উপ-মহাসচিব ও একাধিক পরিচালক দ্বারা সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্যসমূহ

জাতিসংঘ কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হল—

- (১) আন্তর্জাতিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- (২) বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- (৩) আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করা;
- (৪) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবিক ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করা;

(৫) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানব সেবামূলক আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;

জাতিসংঘের মৌলিক নীতিসমূহ

জাতিসংঘ সাতটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—এ মূলনীতিসমূহ হল—

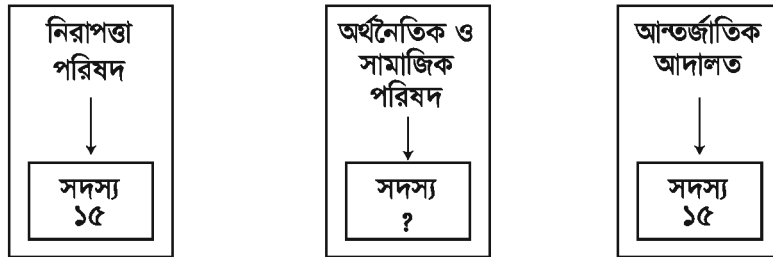
- (১) সকল সদস্য রাষ্ট্র সমান মর্যাদায় সার্বভৌম সদস্য হিসেবে গণ্য হবে;
- (২) সকল সদস্যকে জাতিসংঘ সনদের নীতিমালা পালন করতে হবে;
- (৩) সকল সদস্য রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে হবে;
- (৪) কোনো সদস্য রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগের হুমকি দিতে পারবে না;
- (৫) সনদ অনুসারে জাতিসংঘের গৃহীত ব্যবস্থা সকল সদস্য রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে এবং কোনো রাষ্ট্র জাতিসংঘের গৃহীত ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে পারবে না;
- (৬) সদস্য নয় এমন কোনো রাষ্ট্র জাতিসংঘের মূলনীতির বিরোধিতা করলে সে বিষয়ে জাতিসংঘ ব্যবস্থা নিবে;
- (৭) কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করবে না। তবে কোনো রাষ্ট্র যদি আগ্রাসী তৎপরতা চালায়, তাহলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

জাতিসংঘের ৫০ বছর পূর্তিতে ১৯৯৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সদস্যদের নিয়ে দেওয়া ডায়গ্রামটি লক্ষ কর এবং ১ - ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



১. প্রশ্ন (?) চিহ্নিত স্থানে সদস্য সংখ্যা হবে—

ক. ১৮৯

খ. ৫৪

গ. ১৫

ঘ. ১০

২. মনে কর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা x । পরবর্তী বছর ঐ সদস্যদের কতজন অবসর গ্রহণ করবে?

ক. $x - ২০$

খ. $x - ২৫$

গ. $x - ৩৬$

ঘ. $x - ৪০$

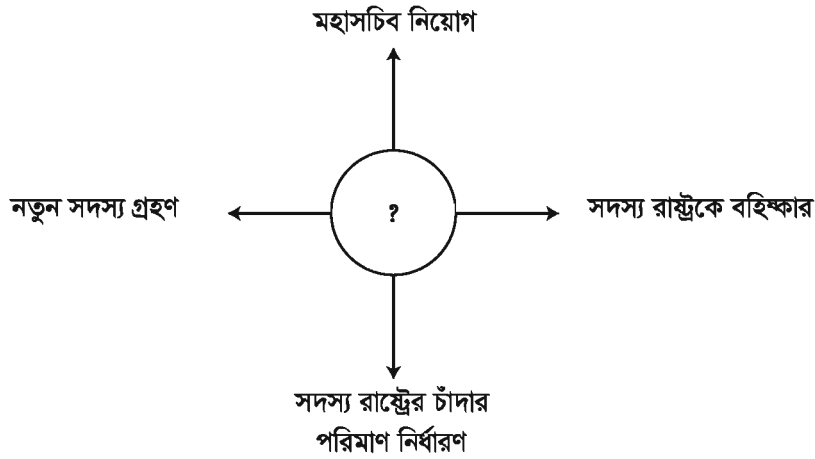
৩. ছকে উল্লিখিত জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা যে কাজগুলো করে –

- আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি
- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- শিক্ষার প্রসার ও মানবাধিকার কার্যকর

নিচের কোনটি সঠিক ?

- i ও ii
- ii ও iii

- i ও iii
- i, ii ও iii



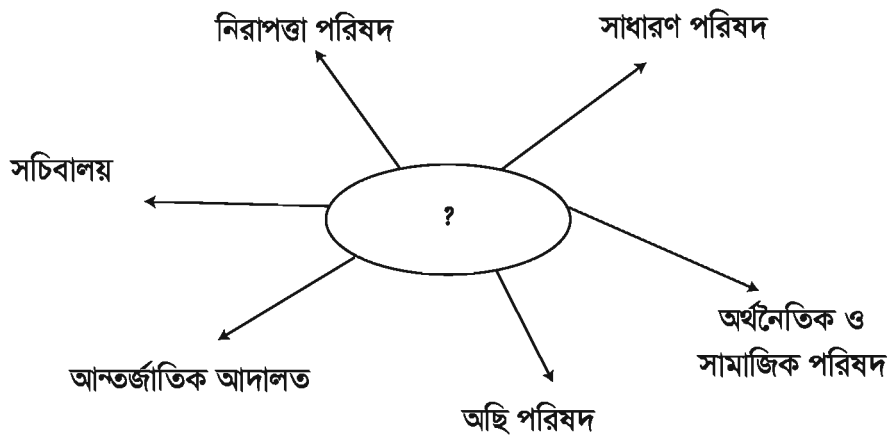
৪. প্রশ্ন ‘?’ চিহ্নিত স্থানে কোনটি হবে ?

- অছি পরিষদ
- আন্তর্জাতিক আদালত

- সাধারণ পরিষদ
- নিরাপত্তা পরিষদ

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



ক. প্রশ্ন “?” চিহ্নিত স্থানে কোন সংস্থাটির নাম হবে ?

- এই সংস্থাটির ১টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
- “প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি থেকেই এই সংস্থাটির জন্ম”—ব্যাখ্যা দাও।
- বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ‘নিরাপত্তা পরিষদের’—মতামত দাও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা

আশেপাশের দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া শান্তি, স্থিতিশীলতা ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন আসে না। এ জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। নির্দিষ্ট এলাকাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন এ ধারণার মূল কথা। এ ধারণা থেকে গঠিত হয়েছে আসিয়ান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ই ইউ), ইসলামিক ঐক্য সংস্থা (ওআইসি), সার্ক প্রভৃতি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা।

আসিয়ান

ইংরেজি ASEAN থেকে বাংলা আসিয়ান। এটি পাঁচটি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ASEAN এর পূর্ণ নাম Association of South East Asian Nations বা দক্ষিণ পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা।

এটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা। ১৯৬৭ সালের ৮ই আগস্ট আসিয়ান গঠিত হয়। ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে এর জন্ম। এ পাঁচটি দেশ এর প্রাথমিক সদস্য। ১৯৮৪ সালে ব্রুনাই ৬ষ্ঠ সদস্য হিসেবে আসিয়ানে যোগদান করে। ১৯৯৫ সালের ২৮শে জুলাই ভিয়েতনাম আসিয়ানের সপ্তম সদস্য হয়। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় এর সদর দপ্তর অবস্থিত। মায়ানমার, কম্বোডিয়া ও লাওস-কে এ সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিন বছর অন্তর আসিয়ানের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আসিয়ান গঠনের উদ্দেশ্য

আসিয়ান গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হল :

- (১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিষ্ট প্রভাবের বাইরে রাখা;
- (২) আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিরসন করা;
- (৩) পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো একটি অভিন্ন অর্থনৈতিক জোট হিসেবে ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করে। অন্যান্য দেশ বিশেষ করে আমেরিকার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিকশিত করতে তারা একত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে চেষ্টা করে। বাণিজ্য প্রসারে আসিয়ান দেশগুলো এভাবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

আসিয়ানের সাম্প্রতিক তৎপরতা

১৯৯৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে এ অঞ্চলকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্র দখলে রাখা, উৎপাদন এবং সংগ্রহ নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। মায়ানমার থেকে উত্তরে ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণে ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিশাল এলাকা পরমাণু অস্ত্রমুক্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আসিয়ানভুক্ত সাতটি দেশ ছাড়াও প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার, কম্বোডিয়া ও লাওস এ পরমাণু চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

আসিয়ানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গঠন করা। ১৯৯৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আসিয়ান বৈঠকে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের পরিকল্পনা হিসেবে ২০০৩ সালের মধ্যে অধিকাংশ সদস্য দেশ অনেক গণ্য শুল্ক হ্রাসে একমত হয়।

এ বৈঠকে মেকং নদীর অববাহিকা উন্নয়নে চীনের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাছাড়া সদস্যভুক্ত দেশে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার বিষয় অনুমোদন করা হয়।

ই ইউ

ই ইউ বা ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (European Union), ইসি (European Community বা ইউরোপীয় সম্প্রদায়) এবং ইইসি (European Economic Community বা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়)–এর পরিবর্তিত নাম।

পারস্পরিক স্বার্থে অভিন্ন বাজার সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ১৯৫৭ সালের ২৫শে মার্চ রোমে পশ্চিম ইউরোপের ছয়টি দেশের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারি বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ড সমন্বয়ে ইইসি বা ইসি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণভাবে এটা ইউরোপীয় কমন মার্কেট নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ড, ১৯৮১ সালে গ্রীস এবং ১৯৮৬ সালে পর্তুগাল ও স্পেন এতে যোগ দেয়। ইইসি বা ইসি–এর পরিধি ও কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ১লা জানুয়ারিতে এ সংস্থার নাম পরিবর্তন করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ই ইউ রাখা হয়। ১৯৯৫ সালে অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে নতুন সদস্যপদ লাভ করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৭টি। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে এ সংস্থার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ই ইউ–এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক স্বার্থে শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে নিজেদের পণ্যের জন্য সুলভ ও সাধারণ বাজার সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা। ইউরোপীয়ান কাউন্সিল, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয়ান কমিশন, ইউরোপীয়ান কোর্ট অব জাস্টিস, ইউরোপীয়ান কোর্ট অব অডিটরস প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্থায়ী কাঠামো গঠিত হয়। ইউরোপীয়ান কাউন্সিল সদস্য দেশের সরকার প্রধানদের নিয়ে গঠিত। এটি ইউনিয়নের শীর্ষস্থানীয় নিয়ন্ত্রক সংগঠন। এর মাধ্যমে ইউনিয়নের নীতিমালা ও নির্দেশিকা তৈরি হয়। ইউরোপীয়ান কমিশনের দায়িত্ব খসড়া আইন প্রস্তুত করে বিবেচনার জন্য ইউরোপীয়ান কাউন্সিলের সভায় পেশ করা।

ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট যাবতীয় আইন প্রণয়ন বিষয়ে সহযোগিতা করে। ইউরোপীয়ান কোর্ট অব জাস্টিস আইন প্রয়োগের ব্যাপারে সহযোগিতা দিয়ে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজেট নিরীক্ষা করে কোর্ট অব অডিটরস।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর নাগরিকরা পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়াই ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে যাতায়াত করতে পারে।

১৯৯৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর মাদ্রিদে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ১৯৯৯ সালের ১লা জানুয়ারি হতে ইউরোপে এক অভিন্ন মুদ্রা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ একক মুদ্রার নাম করা হয়েছে ‘ইউরো’। ‘ইউরো’ মুদ্রা ব্যবস্থার আওতায় নতুন নোট ও ধাতব মুদ্রা চালু হয়েছে ২০০২ সাল থেকে।

ও আই সি

ইথরেজি OIC থেকে বাংলায় ও আই সি। Organisation of Islamic Conference–এর সংক্ষিপ্ত রূপ OIC। বাংলায় পুরো নাম ইসলামি সম্মেলন সংস্থা।

১৯৬৭ সালে আরব–ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল জয়ী হয়ে বিস্তীর্ণ আরব ভূখণ্ড দখল করে। ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২১শে আগস্ট জেরুজালেমে পবিত্র মসজিদ–উল–আকসায় আগুন লাগিয়ে দেয়। মসজিদ–উল–আকসা বাইতুল মোকাদ্দাস নামে পরিচিত। এটা ইসলাম ধর্মের অন্যতম একটি পবিত্র স্থান। এ ধরনের গর্হিত কাজ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে নাড়া দেয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঐ বছর ২৫শে আগস্ট ১৪টি আরব রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ কায়রোতে এক বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৬৯ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্র প্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাবাত শীর্ষ সম্মেলনে ২৪টি মুসলিম

দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যোগদান করেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলাম ধর্মের স্বার্থ সর্থাৎ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭০ সালে জেদ্দায় মুসলিম বিশ্বের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেদ্দায় ও আই সি-র সচিবালয় স্থাপিত হয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান এর প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন।

বিশ্বের মুসলিম শাসিত রাষ্ট্র বা মুসলিম রাষ্ট্র এ সংস্থার সদস্য। ওআইসি-র বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫১। এর সদস্য পদের জন্য মুসলিম শাসিত দেশ বা মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া আবশ্যিক। এর সদর দপ্তর জেদ্দায়।

ওআইসি-র চারটি অঙ্গ সংস্থা রয়েছে। এ অঙ্গ সংস্থাগুলো হল—

- ১। রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের সম্মেলন;
- ২। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন;
- ৩। সাধারণ সচিবালয়;
- ৪। আন্তর্জাতিক ইসলামি আদালত।

ওআইসি-র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- ১। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা;
- ২। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা সংহত করা;
- ৩। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বৈঠকে সদস্য রাষ্ট্রের অভিন্ন স্বার্থে কাজ করা;
- ৪। বর্ণ বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ এবং উপনিবেশবাদের বিলোপ সাধন করা;
- ৫। ইসলামি পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধান করা;
- ৬। ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করা;
- ৭। মুসলমানদের মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার সংরক্ষণের সংগ্রামে মুসলিম জনগণকে শক্তির যোগান দেওয়া;
- ৮। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন দান করা;
- ৯। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- ১০। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার সমস্যা সমাধান করা।

বিশ্বের মুসলমানদের অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর সাথে এক সুন্দর ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে এ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

বাংলাদেশ ওআইসি-র নিচের কমিটিগুলোর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে—

- ১। তিন সদস্যবিশিষ্ট আল-কুদস শীর্ষ কমিটি;
- ২। পনের সদস্যবিশিষ্ট জেরুজালেম মৈত্রী কমিটি;
- ৩। তের সদস্যবিশিষ্ট ইসলামিক সলিডারিটি কমিটি;
- ৪। ইরান-ইরাক শান্তি কমিটি;
- ৫। সংবাদ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি।

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার চতুর্দশ অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ওআইসি-র সহায়তায় ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত গাজীপুরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সর্বাধুনিক প্রতিষ্ঠান আই সি টি ভি টি আর (ইসলামিক সেন্টার ফর টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

সার্ক

সার্ক (SAARC : South Asian Association For Regional Co-operation))—এর বাংলা অর্থ হচ্ছে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। ১৯৭৭ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সরকার-প্রধানদের নিকট এ ধরনের একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাসকারী দেশসমূহের সমস্যা সমাধানকল্পে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এটি গঠিত হয়। সার্কভুক্ত ৭টি দেশ হচ্ছে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ। দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় একশ ত্রিশ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এ সার্ক। সার্ক সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে। ২০০৭ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সার্কের সভায় আফগানিস্থানকে ৮ম দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সার্কের মূলনীতি

সার্কের মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ—

- (ক) এ সংস্থার যে কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে;
- (খ) দ্বিপাক্ষীয় বিরোধ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো এ সংস্থার সভায় তোলা যাবে না;
- (গ) আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক কল্যাণ নীতি সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে;
- (ঘ) এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে সার্ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সার্কের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর সার্ক সনদ স্বাক্ষরিত হয়। সার্ক সনদে আটটি লক্ষ্য স্থির করা হয়। সেগুলো নিম্নরূপ—

- ১। সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনজীবনের মান উন্নয়ন;
- ২। এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নতির ধারা ত্বরান্বিত করা;
- ৩। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ৪। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
- ৫। আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন;
- ৬। অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সম্পর্কে উন্নয়ন করে সার্কের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া;
- ৭। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ, সমস্যা ও ভুল বুঝাবুঝি দূর করে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করা;
- ৮। সার্কভুক্ত সাতটি দেশের পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলা এবং একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

সার্ক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

সার্কের এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে— কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, আবহাওয়া, টেলিযোগাযোগ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত কর্মতৎপরতা, পরিবহণ, ডাক সার্ভিস এবং ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি। এসব ক্ষেত্রের প্রতিটিতে সাতটি দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কার্যকর দল (Working Group) গঠন করা হয়েছে। তারা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

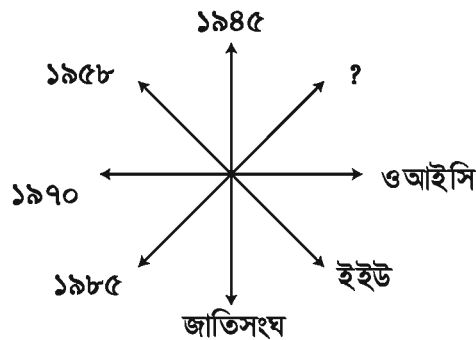
সার্কের কর্মতৎপরতা

এ অঞ্চলের শান্তি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, টেলিযোগাযোগ, আবহাওয়া, পরিবহণ ব্যবস্থা, প্রযুক্তি, ডাক ব্যবস্থা, শিল্প, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সার্কের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো যৌথ কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। সার্কের আদর্শ ও কর্মসূচি সহযোগিতা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নয়নে সার্ক অর্থমন্ত্রী সম্মেলন এবং মহিলাদের স্বার্থ রক্ষার্থে সার্ক মহিলা ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে ঢাকায় সার্ক নেতৃবৃন্দ সাপটা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অবাধ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি সাপটার প্রধান লক্ষ্য। ১৯৯৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর সার্কের দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সার্ক নেতৃবৃন্দ এ অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। নিচের ডায়াগ্রামটি লক্ষ কর এবং ১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



১. প্রশ্ন (?) চিহ্নিত স্থানে কোন সংস্থাটি হবে ?

ক. আসিয়ান

গ. সার্ক

খ. ইইউ

ঘ. ওআইসি

২. বাংলাদেশ কোন কোন সংস্থার সদস্য ?

ক. ইইউ এবং ওআইসি

গ. ইইউ এবং সার্ক

খ. সার্ক এবং ওআইসি

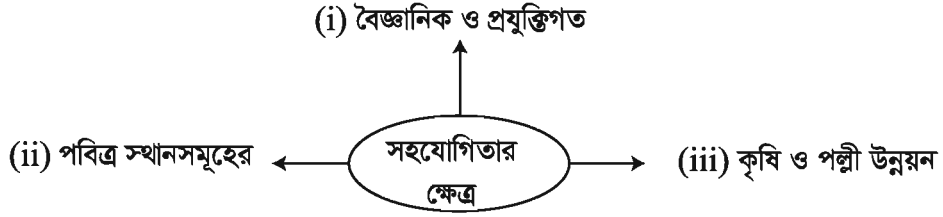
ঘ. ইইউ এবং জাতিসংঘ

৩. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের লক্ষ্য হল —

- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন দান করা।
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা।
- বর্ষ বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ এবং উপনিবেশবাদের বিলোপ সাধন করা।

ওআইসি-এর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i, ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |



৪. সার্কের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক ?

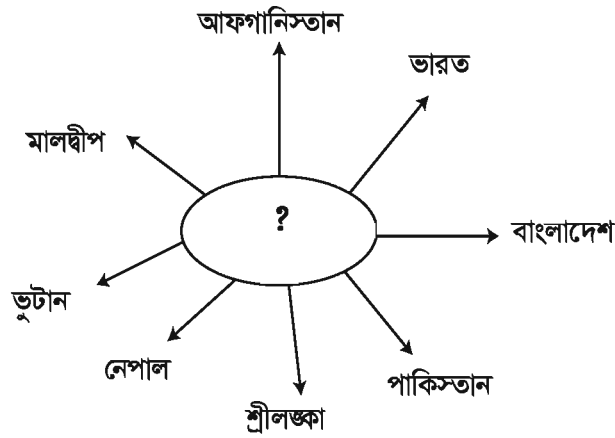
- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. সার্ক জন্মলাভ করে কত সালে ?

- | | |
|---------|---------|
| ক. ১৯৮৩ | খ. ১৯৮৪ |
| গ. ১৯৮৫ | ঘ. ১৯৯৩ |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



- উপরের কোন সংস্থার চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে ?
- এ সংস্থা প্রতিষ্ঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- এ অঞ্চলের শান্তি রক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ সংস্থার ভূমিকা আলোচনা কর।
- বাংলাদেশের সঙ্গে এ সংস্থার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

২. ১৯৬৭ সালে ইসরাইল যুদ্ধের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ আরব ভূখণ্ড দখল করে এবং ১৯৬৯ সালে জেরুজালেমে পবিত্র মসজিদ-উল-আকসায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ইসলাম ধর্মের এই পবিত্র স্থানে এ ধরনের কাজ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে নাড়া দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কেবলমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহই এ সংস্থার সদস্য হতে পারে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংস্থাটি মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

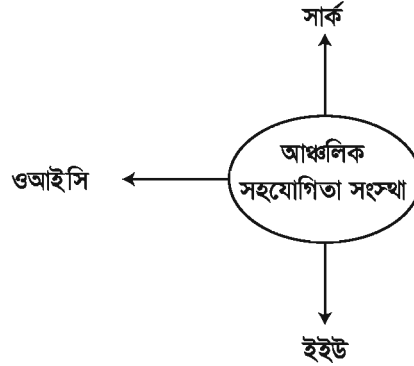
ক. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের আলোকে কোন্ আন্তর্জাতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ?

খ. কেবলমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহই এ সংস্থার সদস্য হতে পারে কেন ?

গ. মুসলমানদের মান মর্যাদা সংরক্ষণে এ সংস্থাটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের সাথে অপরাপর মুসলিম দেশসমূহের সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এ সংস্থার গুরুত্ব অপরিসীম, ব্যাখ্যা কর।

৩. যে কোনো সংস্থা অভিন্ন স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। এ সংস্থা বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক হয়ে থাকে। এ সকল সংস্থার সুনির্দিষ্ট নীতি, লক্ষ্য এবং কর্মতৎপরতা থাকে। নিচে এ ধরনের সংগঠনের একটি চিত্র প্রদর্শিত হল।



ক. অভিন্ন বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন সংস্থাটি গড়ে উঠেছে?

খ. এ সংস্থাটি গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. কোন কোন ক্ষেত্রে সার্কের সঙ্গে এ সংস্থার ভিন্নতা রয়েছে—তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের সাথে ওআইসি-এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

অর্থনীতির চারটি মৌল বিষয়

ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও বাজার

ভোগ

অর্থনীতিতে ভোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ধারণা। অভাব বোধ থেকে মানুষের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা। অভাব পূরণ করার জন্য ভোগের প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার ভোগের প্রয়োজনে উৎপাদন, বিনিময় ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়। ভোগ হচ্ছে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য।

অর্থনীতিতে ভোগ বলতে বোঝায় মানুষের অভাব মেটানোর জন্য ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগের নিঃশেষ সাধন। মানুষের অভাব মেটানোর জন্য কোনো দ্রব্য বা সেবার যে ক্ষমতা থাকে তাকে উপযোগ বলে। দ্রব্যের উপযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার অভাব মেটায়। যেমন, কলম একটি দ্রব্য, কলমের উপযোগ হল এ দ্বারা লেখা যায় এ ক্ষমতা। কলম ভোগ করার অর্থ হল কলমের এ লেখার ক্ষমতা ব্যবহার করা। আবার পিপাসা পেলে আমরা পানি পান করে পিপাসা মেটাই। অর্থাৎ এখানে পানির উপযোগ হল পিপাসা মেটানোর ক্ষমতা। অতএব, পানি ভোগ করার অর্থ হল পানির উপযোগ ব্যবহার করা।

এভাবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য দ্রব্য ভোগ করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে কোনো দ্রব্য ভোগের ফলে এর উপযোগ নিঃশেষ হয়। যেমন, একটি জামা বহুদিন ব্যবহারের ফলে পুরনো হয়ে যায়। তখন আমরা জীর্ণ জামাটি পরি না। এখানে জামাটির উপযোগ ভোগের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু অন্য কোনো কারণে জামাটি নষ্ট হলে কিংবা পুড়ে গেলে জামাটিকে ভোগ করা হল বলা যায় না।

সব দ্রব্যের উপযোগ একবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয় না। কতকগুলো দ্রব্য আছে যার উপযোগ বহু বার ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়। যেমন, একজোড়া জুতা বা কাপড় চোপড় বা আসবাবপত্রের উপযোগ বহুদিন ব্যবহারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়। আবার কোনো কোনো দ্রব্যের উপযোগ একবার ব্যবহারের পরই নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন, আপেল বা কমলালেবু, একবার খেলেই শেষ হয়ে যায়।

সুতরাং মানুষের অভাব মেটানোর জন্য ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে। খাদ্য গ্রহণ, পোশাক পরিধান, বাড়িঘরে বসবাস, রেডিওতে গান শোনা ইত্যাদি হল ভোগের দৃষ্টান্ত। ভোগ্য দ্রব্য বলতে বোঝায় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক পরিচ্ছদ, কালি কলম ইত্যাদি। এসব দ্রব্য পেতে হলে মানুষকে অর্থ ব্যয় করতে হয়। এরূপ ব্যয়কে বলা হয় ভোগ ব্যয়।

কোনো ব্যক্তির ভোগ কতকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত, কোনো ব্যক্তির ভোগ তার আয়ের ওপর নির্ভর করে। যার আয় যত বেশি সে তত বেশি ভোগ করতে পারে। সুতরাং আয় বাড়লে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের দাম বেশি হলে ভোগ হ্রাস পায় এবং দাম কমে গেলে ভোগ বৃদ্ধি পায়। তবে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ভোগ দাম বাড়ার বা কমার সাথে খুব একটা কমবেশি হয় না। ভোক্তার রুচি ও পছন্দ ভেদে ভোগের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন, কেউ মাছ খেতে পছন্দ করে, আবার কেউ মাংস পছন্দ করে।

তৃতীয়ত, মানুষের অভ্যাসের ওপর ভোগ নির্ভর করে। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে অভ্যস্ত দ্রব্যের ভোগ ভোক্তার নিকট অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

একজন মানুষ তার প্রতিবেশীর অনুকরণেও অনেক সময় ভোগ করে থাকে। যেমন, পাশের বাড়িতে রঙিন টেলিভিশন দেখে কেউ একটি রঙিন টেলিভিশন ক্রয় করতে পারে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রয়োজন, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি বিষয় ভোগ নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

অর্থনীতিতে ভোগের গুরুত্ব অপরিমিত। মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হল অভাব পূরণ। দ্রব্য ভোগের দ্বারা অভাব পূরণ করা হয়ে থাকে। তাই ভোগের প্রয়োজনে দ্রব্য উৎপাদন করতে হয়। ভোগের পরিমাণ বাড়লে উৎপাদনের পরিমাণও বাড়াতে হয়। সুতরাং ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

সঞ্চয়

অর্থনীতিতে সঞ্চয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সঞ্চয় মূলধন গঠনের ভিত্তি। আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য জমা রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। যেমন, কোনো ব্যক্তির মাসিক আয় হল ৩০০০.০০ টাকা। এ টাকা হতে সে যদি ২৫০০.০০ টাকা বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় করে এবং অবশিষ্ট ৫০০.০০ টাকা ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে জমা রাখে তবে ঐ ৫০০.০০ টাকা হল সঞ্চয়।

কেবলমাত্র আয় ও ব্যয়ের ব্যবধানকেই সঞ্চয় বলা যায় না। নগদ টাকা অলসভাবে রাখা হলে তাকে সঞ্চয় বলে না। একে নিছক মজুদ অর্থ বলা হয়। কিন্তু জমাকৃত অর্থ কোম্পানির শেয়ার ও সরকারি ঋণপত্রের জন্য ব্যয় হলে কিংবা ব্যাংকে জমা রাখা হলে তাকে সঞ্চয় বলে।

সঞ্চয় দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে (১) সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং (২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা। সঞ্চয়ের ক্ষমতা প্রধানত লোকের আয়ের ওপর নির্ভর করে। লোকের মাথাপিছু আয় যতবেশি হবে, সঞ্চয় করার ক্ষমতাও তত বাড়বে। ধনী লোকের আয় বেশি বলে ভোগের পরও অতিরিক্ত অর্থ হাতে থেকে যায়। ভোগের ইচ্ছার ওপরও সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে। আয়ের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে যদি বেশি ভোগের ইচ্ছা জাগে তাহলে সঞ্চয় বাড়ে না।

সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর সঞ্চয় বিশেষভাবে নির্ভর করে। মানুষের দূরদৃষ্টি, পারিবারিক স্নেহ মমতা, সামাজিক প্রতিপত্তি প্রভৃতি মানুষকে সঞ্চয়ের প্রেরণা যোগায়। এছাড়া দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরও সঞ্চয় নির্ভর করে। ব্যাংকে অর্থ জমা রেখে বেশি লাভ পেলে তাতেও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়ে। সমাজে জানমালের নিরাপত্তা এবং সঞ্চয়ের সুযোগ সুবিধা ও সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের সুবিধা না থাকলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমে যায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সঞ্চয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলধনের ওপর নির্ভর করে। মূলধনের প্রধান উৎস সঞ্চয়। সঞ্চয় হতে মূলধন সৃষ্টি হয়। মূলধন উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যেসব দেশের মূলধন গঠনের হার বেশি সেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। যেসব দেশে সঞ্চয় ও মূলধনের পরিমাণ কম সে সব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্ধর।

বিনিয়োগ

সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলতে ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ ব্যয় করাকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলতে সঞ্চিত অর্থ উৎপাদন কার্যে ব্যয় করাকে বোঝায়। এরূপ ব্যয়ের ফলে সমাজে আয় সৃষ্টির সাথে সাথে মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন কার্যে ব্যয় করাকে বোঝায়। এরূপ ব্যয়ের ফলে সমাজে আয় সৃষ্টির সাথে সাথে মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যে ব্যয়ের মাধ্যমে দেশে মূলধন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ে তাকে বিনিয়োগ বলে। মূলধন দ্রব্য বলতে যন্ত্রপাতি, কারখানার ঘরবাড়ি, উৎপাদনের সরঞ্জাম ইত্যাদি বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের মোট মূলধন দ্রব্যের সাথে যে পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য যোগ করা হয় তাকে বিনিয়োগ বলে। যেমন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কারখানায় ৫ কোটি টাকার মূলধন দ্রব্য রয়েছে। এর সাথে আরও ১ কোটি টাকার মূলধন যোগ করা হল। তাহলে এই ১ কোটি টাকার মূলধনের সংযোজনকে বিনিয়োগ বলে। মনে রাখতে হবে পুরাতন শেয়ার ক্রয় বা আগে থেকেই স্থাপিত কোনো কারখানা ক্রয়ের জন্য অর্থ ব্যয়কে বিনিয়োগ বলা যাবে না। এতে নতুন মূলধন দ্রব্য সৃষ্টি হয় না বরং সম্পদের হাত বদল হয় মাত্র।

বিনিয়োগ দুই প্রকার— (১) ব্যক্তিগত বা বেসরকারি বিনিয়োগ এবং (২) সরকারি বিনিয়োগ। বেসরকারি বিনিয়োগের মূল প্রেরণা হচ্ছে মুনাফার আশা। মুনাফার আশা কম হলে বেসরকারি বিনিয়োগ কম হবে। সরকারি বিনিয়োগে মুনাফার আশা মূল কথা নয়। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করাই এর মূল কথা। এ ছাড়া সেবামূলক কাজের জন্যও সরকারকে অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। যেমন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতির পেছনে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য কাজ করে না।

একটি দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার বিনিয়োগ অত্যাৱশ্যক। উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ যথেষ্ট হয় না। এ জন্য এসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বেসরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগ সহায়ক। মূলধন দ্রব্য সৃষ্টির জন্য সরকার যে ব্যয় করে তাই সরকারি বিনিয়োগ। যেমন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি সেচের বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতির জন্য সরকারি ব্যয়।

বিনিয়োগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে :

প্রথমত, বিনিয়োগ করা হলে দেশে মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ে। যেমন, ১০০০ কোটি টাকা নতুন বিনিয়োগের অর্থ হচ্ছে ১০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি। এরূপ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মূলধন দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের শ্রমিকদের আয় বাড়ে। এর ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদাও বাড়ে।

দ্বিতীয়ত, নতুন বিনিয়োগের ফলে দেশে অধিক পরিমাণে মূলধন দ্রব্য উৎপাদন হয়। নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টির ফলে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম, পরিবহণ সামগ্রী ইত্যাদি নতুন মূলধনী দ্রব্য সৃষ্টি হয়। এগুলো ভবিষ্যতে আরও অধিক দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এতে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে।

বাজার

সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হল অভাব মোচন। মানুষের অভাব মোচনের উপায় হচ্ছে দ্রব্য ও সেবা ভোগ করা। ভোগকারী ভোগের জন্য দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে থাকে। এ সকল দ্রব্য ও সেবার যোগান দেয় বিক্রেতা। ফলে দ্রব্য বা সেবার ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বাজারে লেনদেন ঘটে।

সাধারণ অর্থে বাজার বলতে যে স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতার দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য মিলিত হয় সে স্থানকে বোঝায়। এ অর্থে ঢাকার নিউমার্কেট, চক বাজার, রায়ের বাজার প্রভৃতি স্থানগুলোকে বাজার বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার কথটি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোনো স্থানকে বোঝায় না, বরং কোনো দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকেই বোঝায়। দ্রব্যসামগ্রীর বাজারকে বলা হয় দ্রব্যের বাজার। যেমন, সোনার বাজার, কাপড়ের বাজার, চালের বাজার ইত্যাদি। এ সব দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ একই স্থানে এসে মিলিত হতে পারে অথবা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকতে পারে। যেমন ক্রেতা বাংলাদেশে এবং বিক্রেতা জাপানে অবস্থান করতে পারে। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, দালাল অথবা চিঠি পত্রের মাধ্যমে লেনদেনের সম্পর্ক হতে পারে। সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে নির্দিষ্ট দামে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে অর্থনীতিতে বাজার বলে।

বাজারের বৈশিষ্ট্য

বাজারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, অর্থনীতিতে বাজার বলতে পৃথক পৃথক দ্রব্যের পৃথক পৃথক বাজারকে বোঝায়। সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য একটি পৃথক বাজার থাকবে। যেমন চালের বাজার, পাটের বাজার, কাপড়ের বাজার ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকা চাই। ক্রেতার দ্রব্য ক্রয় করে এবং বিক্রেতার দ্রব্যটি বিক্রয় করে।

তৃতীয়ত, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামের উদ্ভব হয়। ঐ দামে দ্রব্যটি ক্রেতার ক্রয় করে এবং বিক্রেতার বিক্রি করে।

চতুর্থত, বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক থাকে এবং এটি হচ্ছে লেনদেন বা বিনিময়ের সম্পর্ক।

বাজারের শ্রেণীবিভাগ

(ক) ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেন সম্পন্ন হয় সাধারণত দু'ধরনের বাজারে :

(১) দ্রব্য বা সেবার বাজার এবং (২) উপাদান বা উপকরণের বাজার।

দ্রব্য বা সেবার বাজারে ভোগ্যদ্রব্য বা সেবা ক্রয় বিক্রয় হয়। যেমন, চাল, ডাল, বস্ত্র, প্রসাধন দ্রব্য, কেশবিন্যাস ইত্যাদি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার ক্রয় বিক্রয়। উপাদান বাজারে উৎপাদনের উপকরণ ক্রয় বিক্রয় হয়। যেমন, উৎপাদন কাজে ব্যবহার করার জন্য ভূমি, শ্রম, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়।

(খ) দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়ের অঞ্চল বা পরিধির দিক দিয়ে বাজারকে আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয় যখন একটি এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে আঞ্চলিক বা স্থানীয় বাজার বলে। যেমন, মাছ, দুধ, শাকসব্জির মতো পচনশীল দ্রব্যের বাজার। যখন দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় একটি দেশের সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে দেশীয় বা জাতীয় বাজার বলে। যেমন, চাল, ডাল, সাধারণ বস্ত্র ইত্যাদি দ্রব্যের বাজার। আবার যখন কোনো দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে থাকে তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। যেমন, পাট, তুলা, স্বর্ণ ইত্যাদি দ্রব্যের বাজার।

(গ) সময়ের দিক থেকে বিচার করলে বাজার অতিস্বল্পকালীন, স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন হয়ে থাকে। শাকসব্জি, দুধ, মাছ ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় বিক্রয় অতি স্বল্পসময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। যে বাজারে দ্রব্যাদি কিছুদিনের জন্য ধরে রাখা যায় তাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে। যেমন, চাল, ডালের বাজার। আবার যন্ত্রপাতি, দালান কোঠা, গাড়ি ইত্যাদির বাজার দীর্ঘকালীন হয়।

(ঘ) প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার এবং অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার : পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে, দ্রব্য সমগুণ সম্পন্ন হয়, বাজার সম্মুখে ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান থাকে এবং বাজারে একটি মাত্র দাম বিরাজ করে, যেমন, সাধারণ চালের বাজার, সোনার বাজার ইত্যাদি।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার : যে বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা এক বা একাধিক, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমূহ এক রকম বা এক রকমের হলেও গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকে এবং বিক্রেতাগণ দ্রব্যের দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলে।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার প্রধানত দুই ধরনের হয় :

(১) **একচেটিয়া বাজার :** কোনো দ্রব্যের বাজারে মাত্র এক জন বিক্রেতা থাকলে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। বিক্রেতা দ্রব্যের দাম ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন, বাংলাদেশে বিদ্যুতের বাজার—একচেটিয়া বাজারের একটি উদাহরণ।

(২) **একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার :** এ বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি। বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমূহ প্রায় একই ধরনের হলেও তাদের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং বিক্রেতাগণ দ্রব্যের দামের ওপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যেমন, টুথপেস্ট, গায়ে মাখা সাবান ইত্যাদির বাজার একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের দৃষ্টান্ত।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনীতিতে ভোগ হল —

ক. দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা	খ. দ্রব্য বা সেবা গ্রহণ করা
গ. দ্রব্য বা সেবা ব্যবহার করা	ঘ. দ্রব্য বা সেবার উপযোগ নিঃশেষ করা।
২. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার বিনিয়োগ অত্যাৱশ্যক কেন?

ক. খাদ্য ঘাটতি পূরণ	খ. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন
গ. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি	ঘ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সালাম সাহেব একজন চাকরিজীবী। তিনি প্রতিমাসে ১৫,০০০/- টাকা বেতন পান। প্রাপ্ত বেতন থেকে তিনি ১০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন, ৩০০ টাকা ঘরের সিন্দুকে জমা রাখেন। ২০০ টাকা ছেলের স্কুলের বেতন দেন। অবশিষ্ট টাকা দিয়ে সংসারের ব্যয় মিটান।

৩. সালাম সাহেবের মাসিক সঞ্চয় কত?

ক. ৫০০ টাকা	খ. ১০০০ টাকা
গ. ১৩০০ টাকা	ঘ. ১৫০০ টাকা
৪. সালাম সাহেব সঞ্চয় করেন কেন—
 - i ব্যয়ের প্রয়োজন নেই বলে
 - ii ভবিষ্যতে ব্যয় করার জন্য
 - iii সামাজিক নিরাপত্তার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
৫. দ্রব্য বা সেবার ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বাজারে কেন লেনদেন ঘটে?

ক. ভোগকারী বাজার থেকে দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে।	খ. বিক্রেতা বাজারে দ্রব্য বা সেবার যোগান দেয়।
গ. ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য মিলিত হয়।	ঘ. দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারিত থাকে।
 ৬. অর্থনীতিতে বাজার বলতে—

ক. প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য একটি পৃথক বাজার বোঝায়।	খ. দুইটি দ্রব্যের জন্য একটি পৃথক বাজার বোঝায়।
গ. কোনো একটি দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের স্থানকে বোঝায়।	ঘ. একাধিক দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের স্থানকে বোঝায়।
 ৭. উপাদানের বাজারে ক্রয় বিক্রয় হয় —

ক. বস্ত্র	খ. চেয়ার
গ. টেবিল	ঘ. সুতা

৮. নিচের কোনটি একচেটিয়া বাজারের পণ্য ?

ক. টুথপেস্ট

খ. চিনি

গ. সয়াবিন তেল

ঘ. গ্যাস

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রফিক, শফিক ও মফিজ তিন বন্ধু। রফিক, শফিক ভালো বেতনে চাকরি করে কিন্তু মফিজ ছোট একটা দোকানের মাধ্যমে কোনো রকমে সংসার চালায়। রফিক প্রতিমাসে ২০০০ টাকা করে তার স্ত্রীর নিকট জমা রাখে, শফিক ঐ পরিমাণ টাকা ব্যাংকে জমা রাখে, কিন্তু মফিজ কোনো টাকা জমা রাখতে পারে না। উল্লেখ্য যে, রফিক তার স্ত্রীর কাছে যে টাকা জমা রাখে তা অর্থনীতিতে সঞ্চয় নয়।

ক. অর্থনীতিতে সঞ্চয় কাকে বলে?

খ. রফিকের টাকা জমা করা অর্থনীতিতে সঞ্চয় নয় কেন ?

গ. উল্লিখিত আচরণের প্রেক্ষিতে সঞ্চয় কীভাবে বাড়ানো যায় ?

ঘ. শফিকের সঞ্চয় কীভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

২. সেলিম সাহেব চট্টগ্রামে একটি তৈরী পোশাক শিল্পের মালিক। এ শিল্পে তাঁর বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা। তৈরী পোশাক রপ্তানি করে প্রতিবছর তিনি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেন। তাঁর শিল্পে কর্মরত ৫০০ শ্রমিকের জীবনেও এসেছে স্বস্তি। তাঁর শিল্পের পাশেই রয়েছে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি সরকারি বস্ত্র শিল্প। উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও দুটি প্রতিষ্ঠানই একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

ক. তৈরী পোশাক শিল্পের এ বিনিয়োগ কোন প্রকারের বিনিয়োগ ?

খ. এ প্রকার বিনিয়োগের মূল প্রেরণা ব্যাখ্যা কর।

গ. দুটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ভিন্ন হলে কীভাবে একে অন্যের পরিপূরক তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সেলিম সাহেব তাঁর পোশাক শিল্পের মাধ্যমে কীভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন— ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা

তোমরা কি জান বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত? ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১১.১৪ কোটি। ২০০১ সালে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৯৩* কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ১৪.০৬ কোটি** আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত তা কি তোমরা বলতে পার? আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও কখনও খুব কম নয়। আমরা যদি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম। এরই পাশাপাশি পৃথিবীর উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব বাংলাদেশের মতো এসব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। নিচের সারণিটি লক্ষ কর।

সারণি-১

দেশ	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক (শতকরা)
উন্নত দেশ	
জার্মানি	০.০০
জাপান	০.০৫
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	০.৯২
উন্নয়নশীল দেশ	
মিসর	১.৭৮
মালয়েশিয়া	১.৮০
তুরস্ক	১.০৯
স্বল্পোন্নত দেশ	
মায়ানমার	.৪২
কম্বোডিয়া	১.৮২
সুদান	২.৬০
বাংলাদেশ	১.৪১**

সারণিতে যেসব দেশের নাম দেখতে পাচ্ছ সেগুলোর মধ্যে জার্মানি, জাপান এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে উন্নত দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। মিসর, মালয়েশিয়া এবং তুরস্ক উন্নয়নশীল দেশ এবং মায়ানমার, কম্বোডিয়া, সুদান ও বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত। কীভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তোমরা কি কেউ তা বলতে পার?

* আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট, আগস্ট, ২০০১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক-২০০৭ পৃষ্ঠা-১১।

যেসব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো, মানুষের মাথাপিছু আয় বেশি, জীবনযাপনের মান উন্নত, শিক্ষিতের হার বেশি এবং যেসব দেশ শিল্প কারখানায় সমৃদ্ধ, সেসব দেশকে উন্নত দেশ বলা হয়। উন্নত দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল এবং জীবনের মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং শিক্ষা লাভের সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত। যেসব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়, মাথাপিছু আয় অপেক্ষাকৃত কম, মানুষের জীবনযাপনের মান তেমন উন্নত নয়, শিক্ষিতের হার অপেক্ষাকৃত কম এবং যেসব দেশ শিল্প কারখানায় ততটা সমৃদ্ধ নয়, কিন্তু উন্নয়ন কার্যক্রমের তৎপরতা লক্ষ করা যায় সেসব দেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। স্বল্পোন্নত দেশ বলতে সেসব দেশকেই বোঝায় যেসব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল, মাথাপিছু আয় কম, মানুষের জীবনযাপনের মান নিম্নে, যেখানে শিক্ষিতের হারও কম এবং যেসব দেশ শিল্প কারখানায় সমৃদ্ধ নয়।

সারণিতে প্রথম তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে উন্নত দেশ অর্থাৎ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং জাপানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম। এমনকি জার্মানিতে জনসংখ্যা বাড়ছে না বরং কমে যাচ্ছে। অপরদিকে উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রত্যেকটিতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক। সারণি থেকে আমরা আরও বুঝতে পারলাম যে, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব হতাশাজনক নয়। পূর্বে এ হার আরও বেশি ছিল। আশার কথা, বিগত কয়েক বছরে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে কমে কমে বর্তমানে শতকরা ১.৪৮- এ এসে দাঁড়িয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম বা বেশি হবার কারণ -

এবার দেখা যাক কেন বা কী কারণে উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম এবং উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক। নিচে কারণগুলো উল্লেখ করা হল -

- ১। শিক্ষা : তোমরা জেনেছ উন্নত দেশের শিক্ষার হার উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক বেশি। শিক্ষিত জনগণ স্বাভাবিকভাবে নিজেদের ভালোমন্দ সম্পর্কে সজাগ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়, এ সত্য শিক্ষিত জনগণ সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। ফলে তারা নিজ নিজ পরিবারের সন্তানের সংখ্যা কম রাখতে চেষ্টা করে। সব পরিবারের জনসংখ্যা মিলেই তো দেশের জনসংখ্যা। কাজেই পরিবারের জনসংখ্যা কম রাখলে দেশের জনসংখ্যাও কম হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থা এর বিপরীত। যেহেতু এসব দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব রয়েছে, সেহেতু তারা পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব ভালোভাবে বুঝতে পারে না। ফলে এসব দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।
- ২। নারী শিক্ষা : উন্নত দেশের নারী ও পুরুষ উভয়েই শিক্ষিত। তারা ঘরের বাইরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। ফলে কর্মজীবী মহিলারা অধিক সন্তান চায় না। উপরন্তু জীবন যাত্রার উন্নত মানের কারণে এসব দেশে শিশুর প্রতিপালন ও ভরণপোষণও খুবই ব্যয়বহুল। সে কারণেও এসব দেশে সকলেই কম সন্তান চায়। কিন্তু উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। যার জন্য অর্থনৈতিক কাজেও তারা তেমন জড়িত নয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা লেখাপড়ায় অনেক পিছিয়ে আছে, ফলে তারা জনসংখ্যা সমস্যা উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের সন্তান বেশি হয়ে থাকে।
- ৩। বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ : বাংলাদেশে এখনও বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে। শহর অপেক্ষা গ্রামে এর প্রচলন বেশি। অনেকেই খুব অল্প বয়সে বিয়ে করে। মেয়েদেরকেও অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা অল্প বয়সেই অধিক সন্তান লাভ করে। এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে অনেক মা অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং অনেকে সন্তান জন্মের সময় মারাও যায়। এই বাল্য বিবাহের ফলে অল্পদিনেই ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি মিলে তাদের সংসার অনেক বড় হয়ে ক্রমশ পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এছাড়া বাংলাদেশে এখনও অনেক মানুষ একাধিক বিবাহ বা বহু বিবাহ করে। এতেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

- ৪। **শিশু মৃত্যু :** উন্নত দেশে শিশু মৃত্যুহার কম। কারণ এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার অভাব নেই, এখানে শিশু জন্মহারও কম। কারণ এখানকার মানুষ শিক্ষিত এবং সচেতন। ফলে জন্মহার এবং মৃত্যুহারের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রয়েছে। অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মৃত্যুহার আগের চেয়ে কমলেও জন্মহার কিছু ততটা কমেনি। ফলে এসব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও বেশি রয়ে গেছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে যেহেতু শিক্ষার অভাব রয়েছে এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা অপ্রতুল, এখানে শিশু মৃত্যুহার অধিক। ছেলেমেয়ে বাঁচে না বলে মা-বাবা অধিক সন্তান চান। বাংলাদেশে অধিক হারে শিশু মৃত্যুর কারণে মা-বাবা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তারা অধিক সন্তান কামনা করে।
- ৫। **পুত্রসন্তানের প্রত্যাশা :** আমাদের দেশের লোকেরা পুত্র সন্তান কামনা করে। এর কারণ প্রধানত তিনটি (ক) পুত্র সন্তান আয় উপার্জনের উৎস (খ) পুত্র সন্তান ভবিষ্যতের নিরাপত্তা এবং (গ) বংশ ও সম্পত্তি রক্ষায় প্রয়োজন হয় পুত্রের।
- (ক) আমাদের দেশ কৃষি প্রধান। পুত্র সন্তান পিতাকে কৃষিকাজে সাহায্য করে। কাজেই প্রয়োজনে এবং আয় উপার্জন বৃদ্ধির আশায় পুত্র সন্তানকে একটি অমূল্য সম্পদ ও শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। শহরের বসতিবাসীরাও মনে করে যে ছেলের বয়স ৬/৭ বছর হলেই কোনো না কোনো কাজ করে সে পয়সা উপার্জন করতে পারবে।
- (খ) এ দেশের লোকের ধারণা পুত্র সন্তান তাদের ভবিষ্যত জীবনের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। বৃদ্ধ বয়সে ছেলেরা বাবা মায়ের খাওয়া পরা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবে। এ জন্য অধিক সন্তান বিশেষ করে পুত্র সন্তান তাদের কাম্য। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারলে মেয়েও যে মা বাবার দেখাশুনা করতে পারবে এটি তারা বুঝে না।
- (গ) বাংলাদেশের লোকেরা বংশ রক্ষার জন্য পুত্র সন্তান কামনা করে। তারা চায় তাদের মৃত্যুর পর তাদের বংশধররা তাদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করুক। এভাবে পুত্র সন্তানের প্রত্যাশায় পরিবারে সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- ৬। **কুসংস্কার :** তোমরা জান বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম। এদেশে শতকরা ৪৮.৭ জন লোক শিক্ষিত। শিক্ষার অভাবের কারণে এখনও অনেক মানুষের মধ্যে কুসংস্কার বিরাজ করছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যেসব অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে তা তারা বুঝতে পারে না। সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কারের ফলে বহু পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে।
- ৭। **অর্থনৈতিক কারণ :** আমরা জানি উন্নত দেশগুলো কেবল শিক্ষার দিক দিয়েই নয়, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও অনেক উন্নত। উন্নত দেশে দারিদ্র্য কম। বেকার সমস্যাও কম। এখানে শিল্প কারখানায় প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে। জীবন যাপনের মান উন্নত রাখার জন্যই উন্নত দেশের মানুষ পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখতে আগ্রহী। তাছাড়া এখানে পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। অপরদিকে শিক্ষার অভাব এবং দারিদ্র্যের কারণে উন্নয়নশীল এবং বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশের মানুষেরা জীবন যাপনের মান সম্পর্কে সচেতন নয় এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখার ব্যাপারেও সচেতন বা উৎসাহী নয়। এখানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।

বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতি

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হারকে দ্রুত কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২০০২ সালের মধ্যে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে ১.৩২-এ আনার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছিল এবং ২০০১ সালে এ বৃদ্ধির হার কমে ১.৪৮* হয়েছে। কিন্তু কাজিখত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারায় বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪১। জনসংখ্যা সম্পর্কিত বাংলাদেশের শ্লোগান হচ্ছে “ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট”। জাতীয় জনসংখ্যা নীতি মোতাবেক ২০০৫ সাল পর্যন্ত লক্ষ্য নীতি সন্তান প্রজনন হার ১ অর্জন করা। প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে

সচেতন করাই হচ্ছে এই ঘোষণার উদ্দেশ্য। তোমরা যারা স্কুলে পড়াশোনা করেছ তোমাদের জন্য সরকারের নীতি হচ্ছে তোমাদেরকে জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাতে করে তোমরা সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পার। এ উদ্দেশ্যে তোমাদের পাঠ্যবইতে জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকল্পে সরকারি পদক্ষেপ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার কমিয়ে আনার জন্য সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা নিচে আলোচনা করা হল—

- ১। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকার ২০০৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এ ধরনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
- ২। মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করেছে। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের আনয়ন ও ধরে রাখার লক্ষ্যে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সারাদেশে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রীদেরকে উপ-বৃত্তি প্রদানের কর্মসূচি চালু আছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৩। বাল্য বিবাহ রোধ করার জন্য সরকার বিয়ের বয়স নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ছেলেদের ক্ষেত্রে বিয়ের জন্য নিম্নতম বয়স ২১ এবং মেয়েদের জন্য এই বয়স ১৮ বছর।
- ৪। এছাড়াও বাংলাদেশে বর্তমানে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। ছেলে বা মেয়ের বিয়ের সময় কাজি অফিসে রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ করতে হয়।
- ৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ, হাঁস মুরগির খামার, মাছের চাষ এবং অন্যান্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পোশাক শিল্প, কারুশিল্প ও অন্যান্য কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটানো হচ্ছে। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও ক্রমশ অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করছে। জনসংখ্যা রোধে এর শুভ ফলও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উল্লেখ্য যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহও মেয়েদের কর্মসংস্থানে বিশেষ অবদান রাখছে।

জন্মহার বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি

জন্মহার বৃদ্ধি

তোমরা আগেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এই বৃদ্ধির হার এবং কারণ জানতে পেরেছ। এখন জন্মহার কী তা জেনে নাও। জন্মহার বলতে প্রতি ১০০০ লোকসংখ্যার মধ্যে বছরে কয়টি জীবিত সন্তান জন্মলাভ করল তাকে বোঝায়। এই হিসেবে প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্যে শতকরা হিসেবেও প্রকাশ করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ ১০০০ লোকের কোনো মহল্লা বা গ্রামে যদি এক বছরে ৩৫টি শিশু জন্মে তাহলে বলা যায় সেখানে জন্মহার শতকরা সাড়ে তিন বা ৩.৫ জন। এখন নিচের সারণিতে কয়েকটি উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশের জন্মহার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উন্নত দেশে এই হার প্রতি হাজারে ১০ থেকে ১৫ জন। উন্নয়নশীল দেশে ২২ থেকে ২৬ জন, কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে প্রতি হাজারে ১৯.৮৭ থেকে ৩৮ জন। এ থেকে বলা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

* আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট, আগস্ট, ২০০১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সারণি-২

দেশ	স্থূল জন্মহার (হাজারে)
উন্নত দেশ	
জার্মানি	১০
জাপান	১০
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৫
উন্নয়নশীল দেশ	
মিসর	২৬
মালয়েশিয়া	২৬
তুরস্ক	২২
স্বল্পোন্নত দেশ	
মায়ানমার	৩০
কম্বোডিয়া	৩৮
সুদান	৩৩
বাংলাদেশ	২০.৬

তোমরা আগেই জেনেছ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উন্নত দেশে কম, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশে বেশি। এখানেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ উন্নত দেশে জন্মহার কম, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশে তা বেশি।

তবে লক্ষণীয় যে স্বল্পোন্নত দেশ হলেও বাংলাদেশে শিশু জন্মহার বেশ কমে এসেছে। তোমরা এর আগে কেন উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি তা জেনেছ। যেসব কারণে উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হয় ঠিক সেসব কারণেই বাংলাদেশে শিশু জন্মহার এখনও বেশি রয়েছে। আমরা জানি জন্মহার বেশি হলেই একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হবার সম্ভাবনা থাকে।

জন্ম মৃত্যুর খতিয়ান ও জনসংখ্যা পরিবর্তনের ক্রমধারা

এবার তোমরা জন্ম মৃত্যুর খতিয়ান সম্পর্কে জেনে নাও। এই খতিয়ান হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের বিবরণী যাতে কোনো নির্দিষ্ট শহর, ইউনিয়ন বা গ্রাম এলাকার সকল মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর হিসেব লিপিবদ্ধ করা হয়। উন্নত দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে জন্ম ও মৃত্যুর খতিয়ান নিখুঁতভাবে রাখা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই খতিয়ান ততটা নিখুঁতভাবে রাখা হয় না। তবুও শহরগুলোতে জন্ম মৃত্যুর খতিয়ান রাখার দায়িত্ব পালন করে আসছে পৌর করপোরেশন বা পৌরসভাগুলো। পল্লী এলাকায় এ দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের। ইউনিয়নের চৌকিদারগণ জন্ম-মৃত্যুর তথ্য যোগাড় করে। তাছাড়া হাসপাতাল, শাশান, কবরখানা, থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, ক্লিনিক প্রভৃতি স্থানেও জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান রাখা হয়।

এখন তোমরা জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান পর্যালোচনা করলে জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি বের করতে পারবে। কোনো দেশ বা অঞ্চলে এক বছরে যত লোক মারা গেল তার চেয়ে যদি অধিক সংখ্যক শিশু জন্ম নেয় তাহলে বুঝা যাবে যে জনসংখ্যা বাড়ছে। আর যত জন লোক মারা গেল তার চেয়ে যদি কম সংখ্যক শিশু জন্ম নেয় তাহলে বুঝা যাবে যে জনসংখ্যা কমছে। এ থেকেই জনসংখ্যা পরিবর্তনের ক্রমধারা জানা যায়।

* বাংলাদেশ ডাটা শিট ১৯৯৯

বাংলাদেশে ২০০৭ সালে প্রতি হাজারে স্থূল জনসংখ্যার ২০.৬ জন এবং স্থূল মৃত্যুহার ৫.৬ জন ছিল। অর্থাৎ ঐ বছরে প্রতি হাজারে প্রায় ১৫ জন করে লোক বেড়েছে। সুতরাং বুঝতে পারছি কোনো একটি শহর বা এলাকায় এক বছরে কত শিশু জন্মগ্রহণ করল আর কত জন লোক মৃত্যুবরণ করল তার পার্থক্যই হচ্ছে জনসংখ্যা পরিবর্তনের পরিমাপক। উদাহরণস্বরূপ ধর তোমাদের গ্রাম বা মহল্লায় ১০০০ জন লোক বা নারী পুরুষ বাস করে। বছর শেষে দেখা গেল সেখানে ২২টি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে আর ৫ জন লোক মারা গেছে। তাহলে হিসেব করে দেখ তোমাদের গ্রাম বা মহল্লায় এক বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০০ জনে ১৭ জন বা ১০০ জনে ১.৭ জন। এভাবে তোমরা তোমাদের গ্রামের এবং পাশের গ্রামের বা মহল্লার জনসংখ্যা পরিবর্তনের হার বের করতে পারবে এবং ক্রমধারা জানতে পারবে।

সমাজ জীবনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজে যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো এখানে আলোচনা করা হল—

- ১। মাথাপিছু নিম্ন আয় : তোমরা সহজেই অনুমান করতে পার, জনসংখ্যা বেশি হলে দেশের মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয়কে অধিক জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল কম হয় অর্থাৎ মানুষের মাথাপিছু আয় কমে যায়। উন্নত দেশের তুলনায় এ আয় নিতান্তই কম। খাওয়া পড়ার ব্যয় মেটানোর পর আর তেমন কিছুই সঞ্চয় হয় না। মূলধনও গড়ে ওঠে না এবং বিনিয়োগ করা যায় না বলে উৎপাদনও বাড়ানো যায় না। তাই আমরা দরিদ্রই থেকে যাই। বাংলাদেশে ২০০৮ সালে মাথাপিছু বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫২০ ইউএস ডলার।
- ২। খাদ্য ঘাটতি : বাংলাদেশে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাতে আমাদের চলে না। প্রতি বছর খাদ্য ঘাটতি বিরাজ করে। আমাদের আবাদযোগ্য জমির উর্বরতা বাড়িয়ে অধিক ফসল উৎপন্ন করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে না পারলে এ ব্যবস্থাতেও খাদ্য ঘাটতি কমানো যাবে না। কারণ প্রত্যেক জমিরই উৎপাদন ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। এছাড়া খাদ্যশস্য ফলানোর জন্য অধিক জমি ব্যবহার করলে বাসযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাবে।
- ৩। বেকার সমস্যা : আমরা জানি যে, আমাদের মাথাপিছু আয় কম বলে আমাদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম। কলকারখানা গড়ে ওঠে না। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাড়ানো যায় না, ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না। শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোক বেকার থাকে। আমাদের দেশে বর্তমানে বেকার সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে।
- ৪। মূল্যবোধের অবক্ষয় : অধিক জনসংখ্যার কারণে মাথাপিছু সম্পদ ও আয় কমে যায় এবং মানুষ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অভাবের তাড়নায় অনেকেই অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা করে না। এভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। বাংলাদেশেও মূল্যবোধের দারুণ অবক্ষয় ঘটছে।
- ৫। আইন শৃঙ্খলার অবনতি : মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে ক্রমে ক্রমে মানুষ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। জীবিকার তাগিদে তারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জালিয়াতি প্রভৃতি অপকর্ম করতে থাকে। এভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। সমাজ জীবন হয়ে পড়ে নিরাপত্তাহীন। এরূপ অবস্থা আমাদের দেশেও বিরাজমান রয়েছে।
- ৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর : আমরা জানি যে, জনসংখ্যা বেড়ে গেলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা যায় না। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সমস্যা দেখা দেয় এবং অত্যধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তির ফলে শিক্ষার মান নিম্নগামী হয় এবং শিক্ষার পরিবেশও নষ্ট হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম।
- ৭। চিকিৎসা সমস্যা : অসুখ বিসুখে চিকিৎসা লাভ মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু জনসংখ্যা অধিক হলে তাদের জন্য ডাক্তার, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ওষুধ, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। মানুষ ঠিকমতো চিকিৎসা পায় না। আমাদের দেশেও জনগণের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়।

তোমরা বুঝতে পেরেছ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমাজ ও জাতীয় জীবনে তার প্রতিক্রিয়া কেমন ভয়াবহ হতে পারে। পরিবারের আকার ছোট কিংবা বড় হলে তার পরিণতি কী হয় তা নিচের গল্পটি থেকে তোমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

গ্রামে দবিরউদ্দিন মিয়ার ছিল সুখের সংসার। তার ছিল বিশ বিঘা জমি। তিন বিঘা জমির ওপর ছিল তার বাড়ি। দুই ছেলে সলিমউদ্দিন ও কলিমউদ্দিন। বাড়িতে ছিল পুকুর, ফলের বাগান, সবজি বাগান, গোয়াল ঘর, চাকরদের ঘর আর ফসল মাড়াইয়ের চত্বর। দবিরউদ্দিনের কোনো অভাব ছিল না। তার মৃত্যুর পর সলিমউদ্দিন ও কলিমউদ্দিন বাবার সম্পত্তি সমান ভাবে ভাগ করে নিল।

সলিমউদ্দিনের ছোট সংসার। এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে ও মেয়েকে সে লেখাপড়া শেখায়। মেয়ের বিয়ে দেয় ভালো ছেলে দেখে। ছেলে কলেজের লেখাপড়া শেষ করে ভালো চাকরিতে চলে যায়। বাবাকে মাসে মাসে টাকা পাঠায়। সলিমউদ্দিনের হাতে টাকা থাকে। তা দিয়ে সে পুকুর ও বাগানের আয়তন বাড়ায়। আরও জমি কিনে আবাদ বাড়ায়। তার আয় আরও বেড়ে যায়।

অপরদিকে অজ্ঞতার কারণে ও সচেতনতার অভাবে কলিমউদ্দিনের সংসারে অল্প দিনেই অনেক ছেলেমেয়ের জন্ম হয়। ঘন ঘন সন্তান হওয়ার ফলে তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। কয়েক বছরের মধ্যে তার স্ত্রী মারাও যায়। সংসার অচল। কলিমউদ্দিন আবার বিয়ে করে। সেই স্ত্রীরও দেখতে দেখতে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে হয়। এতগুলো ছেলেমেয়েকে কলিমউদ্দিন লেখাপড়া শেখাতে পারে না। ভালো করে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে পারে না। অভাবে পড়ে সে তার পুকুর, বাগান, কৃষি জমি সবই আস্তে আস্তে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এদিকে প্রথম পক্ষের ছেলেদের সাথে দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেদের মিলও হল না। তারা সবাই পৃথক হয়ে ভূমিহীন বেকার শ্রমিকে পরিণত হল। বাবার সাথে কেউ রইল না। কলিমউদ্দিনের অনুতাপ আর দুঃখ কষ্টের সীমা রইল না।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ - ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

একটি দেশের আয়তন ২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং এর জনসংখ্যা ১৬ কোটি এবং মাথাপিছু আয় প্রায় ৪০০ ইউ এস ডলার। এক বছরে দেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ কোটি হল।

১. ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ছিল ?

ক. ১১.১৪ কোটি	খ. ১২.৯৩ কোটি
গ. ১৩.৫ কোটি	ঘ. ১৪.৮ কোটি
২. বর্ণিত দেশটি—
 - i স্বল্প আয়ের
 - ii জনবহুল
 - iii ছোট আয়তন বিশিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |
৩. দেশটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত ?

ক. ৩.২৫	খ. ৪.২৫
গ. ৫.২৫	ঘ. ৬.২৫
 ৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন—
 - i. শিক্ষার হার বৃদ্ধি
 - ii. ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি
 - iii. বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মামুন সাহেব একজন সচেতন নাগরিক। তিনি লক্ষ করেছেন তাঁর গ্রামের আর্থসামাজিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কারণ অনুসন্ধান করে দেখলেন গ্রামটির লোকসংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ছে। অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত এবং তাদের সন্তান সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এ গ্রামের লোকসংখ্যা ৪০০০-এরও অধিক। অথচ পাঁচ বছর পূর্বেও এ সংখ্যা ছিল ২৫০০। এখন গ্রামটিতে হাজারো সমস্যা।

ক. উল্লিখিত সমস্যাটির নাম কী ?

খ. অশিক্ষিত লোকদের অধিক সন্তান ধারণের একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. বিদ্যমান সমস্যাটির কারণে মামুন সাহেবের গ্রামে সৃষ্ট তিনটি অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মামুন সাহেবের গ্রামের উক্ত সমস্যা সমাধানের উপায় যুক্তিসহ বর্ণনা কর।

২. স্কুল শিক্ষক ফরিদ সাহেবের মেয়ে মিনার বিয়ে হয় বিরাট ব্যবসায়ী রফিকের সঙ্গে। কিন্তু শূশুর বাড়িতে গিয়েই মিনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। দাবীকৃত ১ লক্ষ টাকা দিতে না পারায় মিনার জীবনে নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। স্বামীর লোভ আর নিষ্ঠুরতায় তার সুখী সংসারের স্বপ্নের মৃত্যু হয়। অত্যাচার সহ্যে না পেরে মিনা তিন মাস পর গলায় দড়ি দেয়।

ক. অনুচ্ছেদে যে বিশেষ প্রকার ইংগিত দেওয়া হয়েছে তার নাম কী ?

খ. এ প্রথা প্রচলনের প্রধান কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. কীভাবে মিনার স্বপ্নের মৃত্যু হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এ ধরনের সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিরূপণ কর।

ষোড়শ অধ্যায়

যৌতুক প্রথা ও বাংলাদেশের নারী

যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে একটি কুপ্রথা। যৌতুক নারী নির্যাতনের একটি প্রধান কারণ। যৌতুকের অভিশাপে বিবাহিত নারীর জীবনে নেমে আসে বিচ্ছেদের বেদনা। নির্যাতনে ঘটে জীবনের অবসান। যৌতুক সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। সহজ ভাষায় বলা চলে বিয়ের সময় কিংবা বিয়ের আগে বা পরে বরপক্ষ অন্যায়াভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে যে অর্থসম্পদ আদায় করে নেয় তাকে যৌতুক বলে। দেখা গেছে কন্যার পিতামাতা যদি যৌতুক প্রদানে অসমর্থ হন তা হলেও অমানবিকভাবে ছলে-বলে-কৌশলে অর্থলিপ্সু বরপক্ষ তা আদায় করে নেয়।

যৌতুক প্রথা এ দেশের সনাতন হিন্দু সমাজে প্রচলিত। হিন্দু সমাজে নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই বিয়ের সময় কনেকে যৌতুক প্রদান করা হয়। কনের পিতামাতা যতদূর সম্ভব গৃহসামগ্রী ও আসবাবপত্র প্রদান করে থাকেন। তাই এটা একটা প্রথা হিসেবে হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয়েছে। পরবর্তীতে অন্যান্য সামাজিক প্রথার সাথে মুসলমান সমাজেও যৌতুক প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে। অনৈতিকভাবে অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করে কেমন করে ধন সম্পত্তির মালিক হওয়া যায় এ প্রবণতা বহমান সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যৌতুক প্রথা এমনি একটি অনৈতিক পন্থা যার মাধ্যমে অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

ইসলামধর্মে যৌতুক প্রদানের কোনো বিধান নেই। বরং ইসলামধর্মে স্বামী কর্তৃক বিয়ের সময় স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদানের বিধান আছে। এ দেনমোহর স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ। এতে অন্য কারো কোনো অধিকার নেই। এছাড়া ইসলামধর্মের বিধান অনুযায়ী নারী তার পৈত্রিক সম্পত্তি ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। বিবাহিত স্ত্রীকে স্বামী কর্তৃক সাধ্যমতো বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের সামাজিক রীতি।

যৌতুক প্রথার কারণ

বাংলাদেশের সমাজ জীবনে যৌতুকের আদান প্রদানের বিস্তৃতির কারণগুলো নিম্নরূপ –

১। সামাজিক ব্যবস্থা : বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা এখনও পুরুষদের চেয়ে কম। স্বামীর সৎসারে যাতে মেয়েদের অসম্মান করা না হয় তাই মেয়ের পিতামাতা পাত্রপক্ষকে যৌতুক দিতে বাধ্য হয়।

২। দারিদ্র্য : অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ। দারিদ্র্য যৌতুক দাবির অন্যতম কারণ। পাত্রের আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য অথবা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার আশায় কন্যাপক্ষের কাছে যৌতুক দাবি করা হয়।

৩। শিক্ষা : অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষার হার কম। বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার আরও কম। অনেক নারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ফলে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়।

৪। নারীদের পরনির্ভরশীলতা : বাংলাদেশের নারী সমাজ অপেক্ষাকৃত অবহেলিত। এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের ঘরের বাইরে কাজ করা সমাজে গ্রহণীয় নয়। বাংলাদেশের নারী অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল। যৌতুক প্রদান করে তার সামাজিক অবস্থানকে শক্ত করার চেষ্টা করা হয়।

৫। সামাজিক দুর্নীতি : সমাজের কিছু লোক দুর্নীতি করে প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক হচ্ছে। তারা ছেলেমেয়েদের বিয়েতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। তারা অর্থের বিনিময়ে মেয়ের জন্য বর নির্বাচন করে। এতে বরপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছ থেকে বড় রকমের যৌতুকের দাবি আদায়ের সুযোগ পায়। ফলে যৌতুক প্রথা সমাজে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

৬। সামাজিক অস্থিরতা : বর্তমানে সমাজে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। এই সুযোগে সমাজের কিছু মানুষ অনৈতিক পন্থায় প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হচ্ছে। এতে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যৌতুকের বিস্তৃতির পেছনে এটি অন্যতম কারণ।

৭। প্রতিষ্ঠা লাভের মনোভাব : আমাদের সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ছেলে ও তার অভিভাবকগণ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লোভে যৌতুক দাবি করে। বিয়ের সময় দাবি করা হয়, মেয়ের জামাইকে চাকরি, ব্যবসা, বিদেশে পাঠানোর টাকা দিতে হবে। এক্ষেত্রে বরপক্ষ যৌতুক হিসেবে যত বেশি ধনসম্পদ ও টাকা পয়সা আদায় করতে পারে তত বেশি নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে।

যৌতুকের কুফল

বর্তমানে আমাদের সমাজে যৌতুক প্রথা একটা সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে। কনের দীনহীন পিতামাতা বরপক্ষের যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। তারা মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখশান্তির কথা চিন্তা করে জীবনের শেষ সম্বলটুকু বরকে যৌতুক দিতে বাধ্য হন। আবার কনের পিতামাতা বা অভিভাবক বরের দাবিকৃত যৌতুক দিতে যদি একেবারেই অপারগ হন কিংবা যৌতুকের দাবি পুরোপুরি মেটাতে অসমর্থ হন তা হলে নববিবাহিত কনের ওপর নেমে আসে মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন।

যৌতুক প্রথা প্রতিরোধ

যৌতুক প্রথা প্রতিরোধ একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য। এ বিষয়ে সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ যৌতুক বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলছে। যৌতুক প্রথা প্রতিরোধের জন্য নিম্নে উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

১। সামাজিক অধিকার : নারী সমাজকে ন্যায্য অধিকার প্রদান করতে হবে। সাম্প্রতিককালে নারীরা শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে সমাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তারা অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলছে। এটা নারী সমাজের জন্য একটি শুভ লক্ষণ। এতে তাদের ভেতর সামাজিক অধিকার ও সচেতনতাবোধ জেগে উঠছে। এই সচেতনতা যৌতুক প্রথা রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : যৌতুক প্রথা প্রতিরোধের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন মানুষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়ন। এজন্য প্রয়োজন নারী ও পুরুষ সকলের জন্য কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা। অর্থনীতির উন্নয়ন হলে যৌতুক গ্রহণ ও প্রদান অনেকাংশে হ্রাস পাবে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি না হলে এই ঘৃণ্য প্রথা দূরীকরণ সহজসাধ্য হবে না।

৩। শিক্ষার প্রসার : শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। শিক্ষা মানুষকে অধিকার সচেতন করে। শিক্ষার মাধ্যমে নারী পুরুষ সকলকেই দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। তা হলে সমাজে যৌতুক আদান প্রদান কমে যাবে।

৪। গণসচেতনতা বৃদ্ধি : যৌতুক প্রথা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে ব্যাপকভাবে জনমত গড়ে তুলতে হবে। এজন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জনগণকে যৌতুক প্রথার কুফল সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। গণমাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে গণসচেতনতার জন্য সম্পৃক্ত করতে হবে। বিশেষ করে যৌতুক প্রথার কুফল সম্পর্কে ইমাম এবং ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

৫। যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ও সামাজিক বর্জন : যুব সমাজকে যৌতুক বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বিয়ে করার সময় কনেপক্ষ থেকে কোনো প্রকার যৌতুক আদায় না করার জন্য যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এছাড়া সমাজে যারা যৌতুক প্রথার পক্ষপাতি, তাদেরকে সামাজিকভাবে বর্জন করতে হবে।

৬। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিকা : যৌতুক প্রথা নিরসনে গ্রাম সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ইত্যাদি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

যৌতুক বিরোধী আইন ও শাস্তির বিধান

যৌতুকের এ অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশে কতিপয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ যৌতুককে নিষিদ্ধ করে ১৯৮০ সালে ‘যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন’ পাশ করে। এ আইনে বলা হয় যে ‘যদি কোনো ব্যক্তি যৌতুক প্রদান অথবা গ্রহণ অথবা যৌতুক দেওয়া ও নেওয়ায় প্ররোচিত করে তা হলে তাকে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে।’ যৌতুক দাবি সম্পর্কিত শাস্তির এ বিধান ১৯৮৬ সালের যৌতুক নিষিদ্ধকরণ (সংশোধন) অধ্যাদেশের মাধ্যমে পরিবর্তন করে ন্যূনতম এক বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান করা হয়।

অন্যান্য বিষয়সহ যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন রোধকল্পে ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০’ প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটালে মৃত্যুদণ্ড বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান করা হয় এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান করা হয়।

যৌতুকের জন্য নারীকে আহত করা হলে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা আহত করার চেষ্টা করার জন্য অনধিক চৌদ্দ বছর কারাদণ্ড, কিন্তু অনূন্য পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং উভয় ক্ষেত্রে দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনটির যৌতুক সংক্রান্ত বিধানসমূহ ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন দ্বারা সংশোধিত হয়। যৌতুকের জন্য নারীর মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য শাস্তির বিধান অপরিবর্তিত রাখা হলেও নারীকে আহত করা বা আহত করার চেষ্টা করা সম্পর্কিত পদগুলো বাদ দেওয়া হয়। আহতের পরিবর্তে জখম শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মারাত্মক জখমের জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক বার বছর কিন্তু পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডও প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে, সাধারণ জখম করার জন্য অনধিক তিন বছর কিন্তু অনূন্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবার বিধান করা হয়।

সমাজ থেকে যৌতুক প্রথা নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। এজন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার, দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, গণসচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা এবং পাশাপাশি আইনের যথার্থ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন পাশ হয়—

ক. ১৯৭৮ সালে

খ. ১৯৭৯ সালে

গ. ১৯৮০ সালে

ঘ. ১৯৮১ সালে

২. আমাদের সমাজে যৌতুকের কারণ—

i. দারিদ্র্যতা

ii. অশিক্ষা

iii. সামাজিক ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৩. যৌতুক প্রথা প্রচলিত ছিল—

ক. আর্য সমাজে

খ. বৈদিক সমাজে

গ. হিন্দু সমাজে

ঘ. মুসলিম সমাজে

৪. ‘নারী ও শিশু নির্যাতন আইন-২০০০’-এর ধারায় যৌতুকের জন্য নারীর মৃত্যু ঘটলে শাস্তির বিধান আছে—

i. মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ii. অতিরিক্ত অর্থদণ্ড

iii. চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
গ. i ও ii
খ. ii
ঘ. i, ii ও iii

যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা। যৌতুকের কারণে অনেক নারী নির্যাতিত হচ্ছে। যৌতুক নিরোধে প্রয়োজনীয় আইন থাকা সত্ত্বেও যৌতুক প্রথার অভিশাপ থেকে আমরা মুক্তি পাচ্ছি না।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫-৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

৫. যৌতুক প্রথা একটি সমস্যা, কারণ এতে—

- i. পারিবারিক কলহের সৃষ্টি হয়
ii. নারীরা নির্যাতিত হয়
iii. সামাজিক সংহতি নষ্ট হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
গ. ii ও iii
খ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

৬. যৌতুক প্রথা থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়—

- ক. ব্যক্তিগত উদ্যোগ
গ. আইনের প্রয়োগ
খ. পারিবারিক উদ্যোগ
ঘ. সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. তিন সন্তানের জননী ফাতেমার স্বামী আনিস বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি থেকে ১০ হাজার টাকা ধার নেয়। ধারের টাকা সময়মতো পরিশোধ না করে আনিস পুনরায় ৫ হাজার টাকা এনে দেয়ার জন্য ফাতেমার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ফাতেমা রাজি না হওয়ায় তার স্বামী তাকে মেরে জখম করল এবং বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

ক. যৌতুক কী?

খ. ফাতেমার স্বামীর টাকা চাওয়া যৌতুক কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ফাতেমাকে মেরে জখম করার জন্য তার স্বামী আনিসের কী ধরনের শাস্তি হতে পারে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগই যৌতুক প্রথা নিরসনের অন্যতম উপায়—প্রমাণ কর।

২. মিতার দৈনিক পত্রিকার একটি খবরে চোখ আটকে গেল। আজকেও পত্রিকার পাতায় খবর হয়েছে ‘যৌতুকের বলি মাম্মী নামে এক অসহায় গৃহবধূ।’ মিতা খুবই কষ্ট পেল। সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল কেন আমাদের দেশের নারীরা এভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পরিণত হয়? এর জন্য কি কোনো আইন নেই বা সমাজের মানুষের কোনো করণীয় নেই?

ক. ‘যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন’ কত সালে প্রণয়ন করা হয়?

খ. মাম্মীর অকাল মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. তোমার মতে মাম্মীর এই অকাল মৃত্যু আইনের দৃষ্টিতে নির্যাতনকারীদের কী শাস্তি হওয়া উচিত?
ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. যৌতুক নিরসনে সমাজে কী কী পদক্ষেপ কীভাবে নেয়া যায় বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও।